স্থান কাল পাত্র

অমিতাভ চৌধুরী

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা বারো ।

প্রথম প্রকাশ
রথযাত্রা, ১৩৬৫

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
জিতেন্দ্রনাথ বসু
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া
৩।১, মোহনবাগান লেন
কলিকাতা ৪

প্রচ্ছদ
সুবোধ দাশগুপ্ত

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

ব্লক মুদ্রণ
চয়নিকা প্রেস

বাঁধাই
ইউনিয়ন বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

কেউ খ্যাতনামা, কেউ অখ্যাত—নানা সময়ে নানা লোকের সঙ্গে পরিচয়, নানা ঘটনার সামিল। এই দেখা-শোনার বিবরণ 'দেশ', 'আনন্দবাজার', 'ঘরোয়া', 'জলসা প্রভৃতি কাগজে বেরিয়েছিল বিভিন্ন বছরে। একত্র প্রকাশের জন্য আমায় অধমর্ণ করেছেন—ত্রিবেণী প্রকাশন।

অ. চৌ.

'যা পেয়েছি প্রথম দিনে
সে-ই যেন পাই শেষে।''

শুভময়ের স্মৃতিতে

সূচীপত্র

নামেই পাড়াগাঁ, কিন্তু আধুনিক কেতায় আমাদের যে-কোন শহরের চেয়ে বাড়া। রাস্তাঘাট, দোকানপাট, বাড়িঘর সবই ঝকঝকে। আর যে হোটেলে আমার দুদিনের আস্তানা, তার বিলাস-ব্যবস্থা দেখলে চোখ টাটায়।

মিউনিক থেকে ট্রেনে এসেছি হোফ্। হোফ্ থেকে রেহাউ হয়ে জেল্‌ব্—পূর্ব জার্মানী আর চেকোশ্লোভাকিয়ার কোল ঘেঁষে ছোট্ট একটি জায়গা। জেল্‌বের নামডাক তার পোর্সলিন শিল্পের জন্যে। গোটা এলাকার অন্নবস্ত্রের সম্বল কয়েকটি পোর্সেলিনের কারখানা। তার মধ্যে বিশ্বজোড়া খ্যাতির কোম্পানী রোজেনথাল এবং হাইনরিষ।

ভেবেছিলুম, মিউনিকের হোটেল-কাইজারের আরামের কাছে জেল্‌বের পার্ক-হোটেল হবে হেলাফেলার। কিন্তু পা দিয়েই ভুল ভাঙল। মিউনিকের হোটেলের মত এত বড় নয় বটে, তবু বলতে দ্বিধা নেই, পার্ক-হোটেলের সাজানো ঘরদোর আর ২০৯ নম্বর ঘরের ভেতর দামী আসবাব দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ।

সকাল বিকাল ঘুরলুম চেক আর পূর্ব জার্মানীর সীমান্ত। সঙ্গে ছিলেন বাভারিয়ার বর্ডার পুলিসের বড় কর্তা হের কোল্‌ব্। কখনও এগার নদী পেরিয়ে এগারো কিলোমিটার দূর হোহেনবার্গ, কখনও সালে নদীর পারে ম্যডলারথ। বিজলি-তারে সচল কাঁটা-তারের বেড়া ডিঙিয়ে ওপারে যাবার সাহস নেই—যদি গুলি ছোড়ে! বাইনাকুলার লাগিয়ে শুধু দেখতুম, ওপারের কম্যুনিস্ট এলাকায় সীমান্ত পুলিস কী করছে।

চক্কর মেরে মেরে সেদিন আড্ডা জমাচ্ছি পার্ক-হোটেলের রেস্তোরাঁয়। ইতালিযান বন্ধুটি জার্মান ছুঁড়ীর সঙ্গে আশনাই সেরে আমাদের টেবিলে খাবার জোগাচ্ছে। গাইড পিটার ভিল চোঁ-চোঁ করে সাবাড় করলে তিন বোতল বীয়র। আমি আঙুরের রস-ট্রাউবেনজাফ্‌টের গেলাস হাতে নিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি।

এমন সময় নেংচে নেংচে এল এক বুড়ো। এদিক ওদিক 'বাও' করে বসে পড়ল আমাদের টেবিলেরই এক চেয়ারে। ভিল এবং আমি দুজনেই অপ্রস্তুত।

বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা। ঝাপনা কাচের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, ওভারকোট মুড়ি দেওয়া তরুণ তরুণী রেস্তোরাঁর গায়ে-লাগা ফুটপাত দিয়ে আসছে, চলে যাচ্ছে।

বুড়ো ডান ভুরুটা ওপর নীচ নাচিয়ে ভিলকে বললে—"কোত্থেকে আসা হচ্ছে?"

—"মিউনিক।"

—"মিউনিক? চমৎকার জায়গা"—বুড়ো টাকরায় বিজ লাগিয়ে 'চ্চুক-চ্চুক' আওয়াজ করে বলে চললে—"আমিও ছিলুম সেখানে। শ্বাবিং-এর ক্যাবারেতে ক্ল্যারিওনেট বাজাতুম। মিউনিকের মেয়ের তুলনা নেই। গটমট করে চলে, আসতে যেতে চোখের ছুরি মারে, আর দু'বোতল শ্যাম্পেন জোগাতে পারলে কথাই নেই, একেবারে ঢলে"—

বুড়ো কথা শেষ করল না। অতীত স্মৃতির আবেশে দু'চোখ বুজে বসে রইল। ভিল কানে কানে আমাকে বললে —"ভ্যালা বিপদে পড়েছি, বুড়োর অটোবায়োগ্রাফি কে শুনতে চাইছে?"

মিনিট দুই পর চোখ খুলে বুড়ো বললে—"অনেক দিন পড়ে আছি জেল্‌বে। পচা শহর। মেয়েগুলো কাঠখোট্টা নীরস। সেদিন

ইসারায় ডাকলুম একটিকে। এলই না, কটমট তাকিয়ে হুট করে চলে গেল।"

আর শুনতে ভাল লাগছিল না। আমরা দুজন টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লুম। বুড়োকে বললুম—"তাড়া আছে, মাফ করতে হবে।"

তাড়া সত্যিই ছিল। খানিক পরেই আসবেন যোসেফ মিংগেল, হাইনরিষ পোসেলিন কারখানার পি-আর-ও, হের কোল্‌ব্ এবং জেল্‌বের বুর্গোমাস্টার অর্থাৎ মেয়র। আমি এবং আমার সঙ্গী আরও তিনজন ভারতীয় সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্য, শান্তিকুমার মিত্র এবং মনোমোহন মিশ্রকে এই হোটেলেই ডিনারের নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন মেয়র। একখুনি তৈরি হয়ে আমাকে আসতে হবে।

ডিনার টেবিলে বসে আবার সেই পুরাতন সমস্যা। কী অর্ডার দিই? জার্মান বান্নায় বিতৃষ্ণা গত কদিনেই ধরে গেছে। ক্ষুন্নি-বৃত্তির একমাত্র সম্বল ফ্রায়েড চিকেন। তা'ও সব সময় খাওয়া যায় না।

লাল মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে মিংগেল বললেন—"বলুন, কেমন লাগছে আমাদের দেশ?"

"চমৎকার, তাছাড়া আপনাদের আতিথেয়তার ঠেলায় প্রাণ যায়"—আমি জবাব দিই।

'আতিথেয়তা' থেকে কথার মোড় ঘুরল ভারতের রাজনীতিতে। রাজনীতি থেকে কৃষ্ণ মেনন। মেনন থেকে কম্যুনিজম। কম্যুনিজম থেকে পশ্চিম জার্মানীর হালফিল অবস্থা।

কম্যুনিজমের প্রসঙ্গে অনিল ভট্টাচার্য আর মিংগেলে জোর তর্ক। মিংগেল বলেন, "কম্যুনিজম কী ভয়ানক জিনিস, আমরা হাড়ে হাড়ে জানি। তাই ওই দল আমাদের দেশে নিষিদ্ধ। আপনাদের দেশেও তাই করছেন না কেন?"

অনিল ভট্টাচার্য চটপট জবাব দেন—"তা কেন? নিষিদ্ধ

করলে পার্টি আরও জোরদার হবে। আমরা ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক রীতিতে কম্যুনিজম উচ্ছেদ করব।"

কোল্‌ব্‌ ফোঁড়ন কাটেন—"গণতন্ত্র যারা বোঝে না, সেই দলকে গণতন্ত্রে টেনে আনা কেন।"

ভিল সঙ্গে জুড়ে দেয়—"পরে বিপদে পড়বে ভারতবাসীরাই। এখনই সমূলে নাশ করা উচিত কম্যুনিস্ট পার্টিকে।"

অনিল ভট্টাচার্য নাছোড়বান্ধা। গলা সপ্তমে চড়িয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের জয়গান শুরু করে দিয়েছেন। এমন সময় হোটেলের আর একটি ঘরে পিয়ানোর সুরেলা আওয়াজ। নিমেষে আমার মন অন্য দিকে চলে গেল।

রেস্তোরাঁর গায়ে-লাগা ছোট্ট লাউঞ্জ। তারই পূব-উত্তর কোণে আর একটি ঘর। আওয়াজ ওই ঘর থেকেই আসছে।

কম্যুনিজম থেকে আলোচনা আবার মোড় ঘুরেছে রাউরকেলা ইস্পাত কারখানায়। আমি নীরব শ্রোতা। এবং তকখুনি পিয়ানোর টুংটাংয়ের সঙ্গে কয়েকটি মেয়ের খিলখিল হাসির আওয়াজ।

কী হচ্ছে ওই ঘরে? ধুৎতেরি, আমরা এখন নীরস আলোচনায় সময় কাবার করছি, আর ওদিকে পাশের ঘরে ফুর্তি চলছে।

কোল্‌ব্‌ বললেন—"হের শাউডুরি, আপনি চুপচাপ যে, আপনার জন্যে 'লিকিওর' কী অর্ডার দেব?"

খানা ততক্ষণে শেষ এবং এই সারগর্ভ আলোচনাও আহারান্তিক। আমি স্রেফ এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে বললুম—"আপনাদের কথা শুনছি, সবাই কথা বললে চলবে কেন, শোনার লোকও তো চাই।"

আমার কথা শেষ হতে না হতেই সেই ঘর থেকে আর এক-দফা হাসির আওয়াজ। এবং কণ্ঠ কয়েকজন তরুণ তরুণীর। তার সঙ্গে পিয়ানোর পিড়িং পিড়িং আর ডিকেন্টারের টুংটাং আওয়াজ তো আছেই।

ওই ঘরে কারা? কারা আড্ডা জমিয়াছে এই রাত বারটায়? নিশ্চয়ই আসর বসছে আনন্দের। জড় হয়েছেন জেল্‌বের বাছাই করা সুন্দরীরা। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর এখন চলছে মধ্য রাত্রির প্রমোদ।

দূর ছাই, এদিকে সব ফেলে আমরা যত সব আজেবাজে বক-বক শুনছি, আর বুর্গোমাস্টারের টেকো মাথা আর কোল্‌বের নোংরা ঝাঁটা-গোঁফ নিরীক্ষণ করেই এমন সুন্দর রাতটা মাটি করছি।

রাউরকেলা ছেড়ে আলোচনা পৌঁছেছে হিটলার প্রসঙ্গে। ফুয়েরারের কুকীর্তি জার্মান জাতির কতখানি সবনাশ ডেকে এনেছিল তা-ই নিয়ে টেবিলের এপারে ওপারে বাক্যের তুফান ছোটাচ্ছে। ঠিক তখনই ওই রহস্যময় ঘরে গোটা দশবারো বেহালার, মূর্চ্ছনা, সঙ্গে আরও কয়েক রকমের বিলিতি বাজনা। এবং সেই অর্কেস্ট্রার তালে তালে লাস্যময়ী, হাস্যময়ীদের নূপুর নিক্কণ। হায় ভাগবান, আমাকে কেন এই খানাঘরে বন্দী করে রাখলে।

একবার ভাবলুম টেবিল ছেড়ে উঠে যাই, এক ফাঁকে দেখে আসি ওই ঘরের কাণ্ডকারখানা। কিন্তু সাহস হল না, টেবিল ছাড়লে অভদ্রতা হবে যে!

এদিকে রাত একটা, সঙ্গী শান্তি মিত্র হাই তুলছেন। মিশ্র মশাইয়ের চোখেও ঢুলু ঢুলু। শুধু অনিল ভট্টচার্য জোর তর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন। আপাতত আলোচ্য দ্বিধাবিভক্ত বার্লিন।

ওদিকে এখনও বাজনার, হাসির আর নাচের আওয়াজে গোটা ঘর জমজমাট। রাত যত বাড়ছে ফুর্তির মরশুম যেন তত বাড়তির দিকে।

হোস্টদের উপর বিষম রাগ হল। কী দরকার ছিল এত রাত পর্যন্ত আমাদের আটকে রাখার? খাইয়ে দাইয়ে ছেড়ে দিলেই তো পারতো! আর তেমন যদি আড্ডা মারার দরকার থাকে,

চল না বাবা ওই নাচঘরে গিয়েই সবাই বসি। কয়েক গজ দূরে মচ্ছব চলছে, আর আমরা বসে বসে রাজনীতির তর্ক চালাব? এ কেমন কথা।

আমার আর ধৈর্য রইল না। 'টয়লেটে' যাবার নাম করে উঠে পড়লুম। যা থাকে বরাতে, ওই নাচঘরে এবার ঢুকে পড়ব। কানের কাছে এমন আওয়াজ আসবে, আর চুপ করে বসে থাকব কোন বেয়াকুবিতে? আমিও তো এই হোটেলের পয়সা-দেনেওলা মুসাফির!

এদিক ওদিক তাকিয়ে সেই ঘরের দিকে এগোলুম। বাজনা আরও জোরদার, মেয়েদের হাসির আওয়াজ আরও মধুঢালা। আমি 'টাইটা' ঠিক করে নিলুম। মনে মনে ভাবলুম, সঙ্গীরা মরুক ওই টেবিলে বসে, আমি আর যাচ্ছিনে খাবার টেবিল।

ঘরের পর্দা সরাতেই চিচিং ফাঁক। অন্ধকার ঘর। ঘরে লোক-জন নেই। শুধু এক কোণে সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে দুই বুড়োবুড়ি। আর অন্ধকারের মাঝখানে জ্বলছে সব আওয়াজের আধার একটি অতিকায় টেলিভিশন সেট।

এমন অ্যান্টি ক্লাইমেক্স আমার জীবনে আর ঘটে নি। ফের গুটিগুটি খাবার টেবিলে গিয়ে বসলুম। আলোচনা তখন বার্লিন থেকে গোয়া।

এভমুর্টে মেয়ার

শান্তিনিকেতনে থাকতে আমাদের একটি জনপ্রিয় খেলা ছিল 'অ্যাকটিং'—পিকনিকে, এক্সকার্সনে অনিবার্য। প্রথম কে শিখিয়েছিল ঠিক মনে নেই (সম্ভবত সংগীত-ভবনের শ্রীবীরেন পালিত), তবে শুনেছিলুম জাপানীদের মধ্যে নাকি এ খেলার চল আছে।

খেলাটা মজার। মাঝখানে খালি জায়গা, দু'দিকে বসে থাকে দু'দল লোক। একদল থেকে একজনকে ডেকে আনা হল প্রতিপক্ষ-দলের কাছে। কানে কানে বলা হল একটি নাম—বার্ণাড শ, রবীন্দ্রনাথ বা জো লুই। কিংবা অন্য যে-কোন একটা। তাকে একটিও কথা না বলে আকারে ইঙ্গিতে, অঙ্গভঙ্গি করে নিজের দলকে বোঝাতে হবে কী সেই নাম। মাঝের ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে সে দেখাবে। বোঝাতে পারলে তাঁর দলের ভাগে পড়ল এক পয়েন্ট। না পারলে গোল্লা।

ঠিক তেমনি এই দল থেকে আর একজনকে ডেকে নেওয়া হবে এবং একই কায়দায় অন্য কোন নাম বোঝাতে হবে। শেষে গুনে দেখা হবে, কার ভাগে কত পয়েন্ট।

বোঝানোর সুবিধের জন্যে সম্বল ছিল কয়েকটি সংকেত। যেমন দ্রষ্টব্য ব্যক্তি ছেলে হলে বুড়ো আঙুল। মেয়ে হলে কড়ে আঙুল। আর তিনি যদি মৃত হন, তাহলে ঘাড়ের ওপর দিয়ে কিংবা কোমরের পাশটায়, থাক গে' বলার ভঙ্গিতে দু হাত দোলাতে হবে। ব্যস ওইটুকুই, বাকি খেলোয়াড়ের কেরামতি। দ্রষ্টব্য ব্যক্তির চেহারা, ছবি, পেশা, দেশ সব বোঝানোর দায়িত্ব ইংগিতের।

অভিজ্ঞতা

এই 'মুদ্রাভিনয়ের' অভিজ্ঞতা কাজে লেগে গেল জার্মানী বেড়াতে এসে। সাধারণ লোক ইংরেজি জানে না, আমি জানি না জার্মান। তাদের সঙ্গে মিশতে গেলেই তাই শান্তিনিকেতন-জীবনের সেই অ্যাকটিং খেলা বেমালুম চালিয়ে দিই,—দোস্তী তৎক্ষণাৎ জমে।

পূর্ব বার্লিনে এসে চমৎকার অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। সেদিন ৮ই মে, পঁচিশে বৈশাখ। আমাদের বাংলাদেশের উৎসব। কম্যুনিস্ট-শাসিত পূর্ব জার্মানীর এই শহরে এসে দেখলুম, সেখানেও উৎসবের ছুটি। এই তারিখেই মিত্র শক্তির কাছে জার্মানীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আত্মসমর্পণের দিন। সবাই জড় হয়েছে শহরের লাগোয়া ওআর মেমোরিয়েলে।

গিয়ে দেখি আশ্চর্য সুন্দর জায়গা। দু'ধারে ফার আর চেরী গাছের ভিড়, পপলারের সারি। কাতারে কাতারে লোক ফুলের মালা নিয়ে ঢুকছে, বেরোচ্ছে।

অতিকায় এক মূর্তি সামনে এক উঁচু বেদিতে। সিঁড়ি বেয়ে নামছি, হঠাৎ একদল ছোকরা ছেলেমেয়ে ছেঁকে ধরল। চেঁচিয়ে উঠল—"ইণ্ডার, ইণ্ডার, নেহরু।"

ব্যাপারখানা কি? দলের একজন ভাঙা ইংরেজি জানে। বললে, "তোমার সঙ্গে ছবি তুলব।"

কৃষ্ণবদন নিয়ে আমি শ্বেতাঙ্গিনীদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লুম। অনেকগুলো ক্যামেরা একসঙ্গে বলল—ক্লিক, ক্লিক, ক্লিক, আমি বললুম—'ডাংকেশ্যোন।' অর্থাৎ ধন্যবাদ।

এইখানেই আমার আলাপ এডমুর্টে মেয়ারের সঙ্গে। কিছুক্ষণের পরিচয়, কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলব না।

ছবি তোলার পালা শেষ করে বাঁ পাশের রাস্তায় স্তালিনের বাণী খোদাইকরা ফলকগুলোর দিকে যখন এগোচ্ছি, তখন পেছন থেকে হঠাৎ ডাক।—"হে ইণ্ডার!"

চেয়ে দেখি, লাল জ্যাকেট পরা কুড়ি বাইশ বছরের এক মেয়ে

আমায় আঙুল নেড়ে ডাকছে। কৌতূহল অপরিসীম, তবু সাহস পেলুম না। একে বিদেশ-বিভূঁই, তদুপরি সুন্দরী তরুণী। না বাবা, দরকার নেই ঝামেলায়।

না দেখার ভান করে সামনে এগোলুম। কিন্তু আমি ছাড়লে কী হবে, 'কম্‌লি নেহি ছোড়তি।' মেয়েটি ছুটে পাশে এসে দাঁড়াল। টানা চোখজোড়া আমার সারা গায়ে বুলিয়ে প্রশ্নের ভঙ্গিতে বলল—"কালকুট্টা?"

আমার তখন উত্তর দেবার ফুরসৎ নেই। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি। মেয়েতো নয়, আগুন! পরনে লাল চামড়ার জ্যাকিন আর পুরু স্ল্যাক্স। যেমন ঠোঁট, তেমন নাক—একেবারে খোদাই করা। আর চোখ তো নয়, আগুনের হল্‌কা। এক একটা চাউনি, এক একটা অঙ্গ পুড়িয়ে মারছে। চুল? তার তুলনা দেবার ভাষা আমার নেই। জীবনানন্দী ভাষায় একেবারে 'কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।' গোলাপী মুখের মায়া কাটিয়ে হাওয়ায় উড়ে যেতে চাইছে।

মেয়েটি তখনও একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। আবার বললে—"কালকুট্টা?"

এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেলুম। দু'বার ঢোক গিলে বললুম—'ইয়া।' অর্থাৎ 'ইয়েস।'

বললুম আর মরলুম। মেয়েটি আমায় বগলদাবা করে হিড়-হিড় টেনে নিয়ে চলল। সদর ফটকের বাইরে ছোট মাঠটায় সার সার গাড়ি, সার সার মোটর সাইকেল, স্কুটার। একটি স্কুটারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে এক গাট্টাগোট্টা মাঝবয়সী জার্মান। সুন্দরবনের বাঘিনী যেমন শিকার মুখে করে এনে জংগলের আড়ালে হেঁচকা মেরে ফেলে দেয়, এই জার্মান-রায়-বাঘিনীও আমাকে তেমনি ওই মাঠটায় এনে দাঁড় করিয়ে দিল। তার পর ওই মাঝবয়সী জর্মানটার সঙ্গে 'হুম-হাম' করে কী যেন

বলল, আর পলক ফেলতে না ফেলতে আমাকে ঠেলে বসিয়ে দিল ওই স্কুটারের পেছনের সীটে।

মুহূর্তে হুংকার। মেয়েটি সামনের সীটে বসে দিল স্টার্ট। একটিও কথা না বলে স্কুটার ছুটিয়ে দিল ঝড়ের বেগে। সামনে চাওড়া অটোবাহ্‌ন—ন্যাশনেল হাইওয়ে।

আমার তখন দেবীচৌধুরাণীর হরবল্লভের মত অবস্থা। 'ডুবিয়াই যখন গিয়াছি, তখন দুর্গামান জাপিয়া কী হইবে!' এদিকে গাড়ি, ওদিকে মোটর সাইকেল—আশী নব্বই কিলোমিটার বেগে আমাদের স্কুটার ছুটছে। বাড়িঘর, গাছপালা সিনেমার মন্তাজের মত হুদ্দাড় পালিয়ে যাচ্ছে। আর আমি? সেই সুন্দরী খাণ্ডারণীর কোমর জড়িয়ে রুদ্ধশ্বাস বসে আছি। তার ঘনকালো চুলের রাশ হাওয়ায় উড়ে আমার চোখে অনবরত ঝাপটা মারছে।

স্কুটার থামল এক গেঁয়ো গির্জের কিনারে। পাশেই আপেল গাছের বাগান। গাড়ি খাড়া করে রেখে মেয়েটি আমায় টেনে এনে বসাল ওই বাগানে। আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়ব ছাড়ব করছে। মেয়েটার নির্ঘাৎ কুমতলব আছে! গলা টিপে মেরেটেরে ফেলবে না তো?

এতক্ষণ পর সুন্দরী ঠোঁট খুলল। বিন্দুবিসর্গ বুঝলুম না। কট্টর জার্মান ভাষার কিড়িমিড়িতে আমি আবার তালগোল পাকিয়ে ফেললুম। যে দু'চারটি শব্দ সম্প্রতি আয়ত্তে এনেছি, তার একটা জগাখিচুড়ি পাকিয়ে এবং শান্তিনিকেতনের সেই অ্যাকটিং খেলার শরণ নিয়ে বলতে চাইলুম—"সুন্দরী, অনেক রহস্য করেছ, আর না। এবার আমাকে রেহাই দাও।"

পাত্রীটি সোজা নয়, আমার কথা আদপেই আমল দিল না। এবং টের পেলুম, শান্তিনিকেতনের ছাত্রী না-ই-বা হল, অ্যাকটিং খেলায় সে আমার চেয়ে সরেস। একটা ডট পেন, একফালি কাগজ আর আকার ইঙ্গিতের আশ্রয় নিয়ে চমৎকার আমার

সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। আমিও হুঁ-হাঁ করলুম, হাত নাড়লুম. ঠোঁট নাড়লুম।

বরাত ভাল, সে জানে দু-চারটে ইংরেজি শব্দ। আর আমি জানি দু-চারটে জার্মান। ওই মুদ্রাভিনয়ের সঙ্গে জানা শব্দগুলো কাজে লাগাতে পেরে আমরা দুজনেই মহাখুশী।

হঠাৎ আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল —"ভী শ্যোন ডু বিস্ট।" অর্থাৎ কিনা 'তুমি বেশ সুন্দর দেখতে।'

মেয়েটিতো হেসে কুটিকুটি। চীৎকার করে উঠল—"আখ্ সো।" অর্থাৎ 'ঠিক বলেছ।' খানিকবাদেই সোহাগের সুরে বললে—"মাইন লীবলিং।" বলেই গলা জড়িয়ে ধরে আরকি!

খেয়েছে, আমি গলা বাঁচিয়ে পিছু হটে যাই।

মেয়েটির নাম, আগেই বলেছি, কডমুর্টে মেয়ার। বাড়ি বার্লিন থেকে একশ ষাট কিলোমিটার দূরে হাফেলবার্গে। ছুটির দিন, বেড়াতে এসেছে স্কুটারে চড়ে। কিন্তু আমার দিকে এই কৃপা-দৃষ্টি কেন?

দেখেই চিনেছি, তুমি ইণ্ডার ভারতের লোক। আর চিনেছি তোমার বাড়ি কালকুট্টা—কলকাতায়। 'জান্তশের' বাড়িও যে কালকুট্টায়। নিশ্চয়ই চেন তুমি তাকে,—জান্তশ ব্যাগশি?

আমি কিছুই ঠাওর করতে পারি না। জান্তশ ব্যাগিশ? সে আবার কী জন্তু?

—ওরে ইণ্ডার, তোমার জ্বালায় আর পারি নে। জান্তশ ব্যাগশি। এখানে পড়তে এঁসেছিল কালকুট্টা থেকে। চার বছর ছিল। এই দেখ না তার ফটো।

মেয়েটি খুশিতে ডগমগ এবং এবার ঠাওর হল, সন্তোষ বাগচি নামে কলকাতার কোন বাঙলী ছাত্রের কথাই বলছে ফ্রলাইন। কিন্তু কলকাতা কি দু'-তিন শ' লোকের পাড়গাঁ, যে সবাইকে আমি চিনব?

—"নিশ্চয়ই চেন"—মেয়েটির চোখ হঠাৎ ছলছল। যেন একজোড়া চোখেয় ঝিনুকে স্বাতী নক্ষত্রের জল টলমল করে উঠল।

"তোমারই মত গায়ের রঙ। আমার মত ফ্যাক্‌ফ্যাকে ফর্সা নয়। ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল যে লিপজিগে! আলাপ থেকে ভালবাসা। জাস্তশ আমায় কথা দিয়েছিল বিয়ে করবে। দেশে পৌঁছেই আমাকে নিয়ে যাবে। সে আশায় আমি এতদিন বসেছিলুম। আজ দু'বছর হল, তার কোন চিঠি নেই।"

মেয়ার আঁর কথা বলতে পারল না, ফটোটা বুকে আঁকড়ে আমার দিকে অপলক চেয়ে রইল। চোখে মিনতি। যেন আমিই সেই সন্তোষ বাগচি—যে তাকে কথা দিয়েছিল বিয়ে করবে। তাকে ভারতে নিয়ে যাবে, এবং এখন যে কথার খেলাপ করছে। যেন আমার একটি কথার উপরই এই মেয়েটির ভবিষ্যৎ, সব আশা-আকাঙ্খা।

কিন্তু কী উত্তর দেব এই বিদেশিনীকে? হায় ভগবান, এমন বিপাকে কেন ফেললে আমাকে!

হাত তুললুম, ঠোঁট নাড়লুম। বোঝাতে চাইলুম—বিশ্বাস কর, আমি ওকে চিনি না, অমন সুন্দর মুখের প্রতি অবিচার যে করে, সে নরাধম সন্দেহ নেই, কিন্তু তোমাকে কী বলে সান্ত্বনা দেব মেয়ার?

মেয়ার রেগেমেগে উঠে দাঁড়াল। চোখের জল এক ঝটকায় মুছে ফেলে ফের স্কুটারে স্টার্ট দিল। আমি—যেন অপরাধী, পিছু পিছু এগিয়ে পেছনের সীটে বসলুম। মেয়ার দাঁত কিড়মিড় করে কী যেন বলল। টের পেলুম, ও বলতে চাইছে—সব ইণ্ডারই সমান।

আনন্দ, বিষাদ, ঘৃণা—একটার পর একটার সে প্রতিমূর্তি। মেয়ারের ঠোঁট কাঁপছে।

—গত আট মাস থেকে হেক্টার পেছনে ঘুরছে। ঠিক আছে, তাকেই বিয়ে করব। এতদিন তাকে পাত্তা দিই নি, আজ থেকে দেব। কালই বিয়ে করব হেক্টারকে।

মেয়ার কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললে সেই সযত্নে রাখা ফটো।

স্কুটার আবার ফিরে চলল দ্বিগুণ বেগে। এবং দাঁড়াল ওআর মেমোরিয়েলের সেই ছোট মাঠটায়।

চোয়াড়ে চেহারার সেই মাঝবয়সী জার্মানটি তখনও ওখানে দাঁড়িয়ে। মেয়ারকে দেখেই দাঁত বের করে এগিয়ে এল।

আমার মুখে কোন কথা নেই। এক ঝলক আগুন আর এক ঝলক ঘৃণা আমার চোখেমুখে ছিটিয়ে মেয়ার হেক্টারের কোমর জড়িয়ে সেই স্কুটারের পেছনের সীটে বসল। এই পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হেক্টারের সঙ্গেই মেয়ার এখানে এসেছিল।

পাশ দিয়ে স্কুটার বেরিয়ে যেতে মেয়ার আবার কটমট করে তাকাল আমার দিকে। আমি তখনও ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। ঝড়ের বেগে উড়ে যাওয়া দূর স্কুটারের দিকে।

লালঘোড়ার সরাই

"এই ঘরে গ্যারিক ছিলেন ?"

আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে সেণ্ট্রাল অফিস অব ইনফরমেশনের মিস্টার আলফ্রেড ইভান্স বলেন, "হ্যাঁ, এই ঘরেই। ১৭৬৯ সনে এখানে যখন শেক্সপীয়ার জুবিলি উৎসব হয়, খ্যাতনামা নট গ্যারিক এসেছিলেন পরিচালনা করতে, এবং উঠেছিলেন এই রেড হর্স হোটেলেই।

একুশ নম্বর ঘরটার দিকে আবার ভাল করে তাকাই, খাট টেবিল আয়নায় হাত বুলোই। কেন না আমিও যে এক রাত কাটাতে ওই ঘরটিতে আশ্রয় নিয়েছি।

স্ট্র্যাটফোর্ড-আপন-এভনে ব্রিজে স্ট্রীটের ওপর এই রেড হর্স হোটেল। রয়েল শেক্সপীয়ার থিয়েটার হোটেল থেকে মাত্র তিন শ গজ দূর, হেনলী স্ট্রীটে শেক্সপীয়ারের বাড়ি আড়াই শ গজও নয়।

এই মাত্র 'এ মিড সামার নাইটস ড্রিম' অভিনয় দেখে এসেছি। —এ পর্যন্ত আমার জীবনে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় সন্ধ্যা আজকেরটি। আলোর চোখধাঁধানি নেই, মঞ্চসজ্জার ভোজবাজি নেই, স্রেফ অভিনয়ের জোরে পুরো তু ঘণ্টা পরিচালক পিটার হলের এই অভিনেতা-গোষ্ঠী মাতিয়ে রেখেছে। বিশেষ করে 'বটমের' ভূমিকায় পল হার্ডউইকের তুলনা নেই।

লণ্ডনে কভেণ্ট গার্ডেনে রয়েল অপেরা হাউসে ওই একই নাটক দেখেছি—প্রযোজনা জন গিলগুডের। কিন্তু নির্দ্বিধায় বলতে পারি, স্ট্যাটফোর্ড-আপন-এভনের অভিনয়ের সঙ্গে তুলনায় সে জিনিস পানসে।

এভন নদীর পারে থিয়েটারের বাড়িখানাও চমৎকার। এই ছোট্ট বাড়িটির নক্সাকার শ্রীমতী এলিজাবেথ স্কট। নতুন তৈরি হয়েছে ১৯৩২ সনে। আগের বাড়ি পুড়ে যায় ১৯২৬ সনে, আগুনে।

থিয়েটার দেখার আগে ঘুরে এসেছি শেক্সপীয়ারের বাড়ি, এবং অ্যান হ্যাথাওয়ের কুটির, হোলি ট্রিনিটি চার্চ—যেখানে মহাকবির দেহ সমাধিস্থ।

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি শেক্সপীয়ার যে বাড়িতে জন্মেছিলেন, তার আসল চেহারা আজ আর নেই, তবে এমন কায়দায় ঘরদোর, আসবারপত্র রাখা হয়েছে, দেখে মনে হবে, বুঝি সব কিছুই চার শ' বছর আগেকার।

কাঠের কাঠামোয় তৈরি এই তিন ঘোমটাওলা দোতলা বাড়িটি জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে কেনা হয়েছে ১৮৪৭ সনে। তারপর এলিজাবেথীয় কায়দায় অনেক খেটেখুটে সব সাজিয়ে রাখা হয়েছে, ঠিক যেমনটি থাকা চাই।

আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে দোতলায় কবির জন্মগৃহ। কাঠের মেঝে এবং নীচু সীলিং। কড়ি বরগাও আঁকাবাঁকা ধরনের। ঘরের মাঝখানে পালঙ্ক। এবং কোণে ছোট শিশুর জন্যে ছোট্ট একটি দোলনা।

আসল বিস্ময় কিন্তু লুকিয়ে আছে বাঁ দিকের জানলার কাঁচে। ভারতবর্ষের যে কোন দ্রষ্টব্য স্থানে গেলে আমরা যেমন দেখি মন্দিরের গায়ে বা পাথরে আঁকাবাঁকা অসংখ্য পেরেক দিয়ে হিজিবিজি অনেক কিছু লেখা, নাম খোদাই করা। তেমনি ওই জানলার কাঁচেও নানা সময়ে যাঁরা এই বাড়ি দেখতে এসেছিলেন, তাঁদের অনেকে নিজের নাম খোদাই করে গেছেন ওর জায়গাটিতে।

সম্প্রতি ওই 'ভ্যাণ্ডেলিজম' থেকে কয়েকটি নাম উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারপ্রাপ্তদের তালিকায় আছেন টমাস কার্লাইল,

আইজাক ওয়াটাস, স্যার ওয়াল্টার স্কট, জন টুল, হেনরি আরভিং, এলেন টেরী—বিশ্ববিশ্রুত কয়েকটি নাম।

এভন নদীর পারে এই স্ট্র্যাটফোর্ডে এসে আমার কেবলই মনে হয়েছে যেন শান্তিনিকেতনে এসেছি। এ মিড সামার নাইটস ড্রিম' দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, বছর পনের কুড়ি আগেকার শান্তিনিকেতনে 'শ্যামা' কিংবা 'চিত্রাঙ্গদা' দেখছি। এবং এখানে এসে সবসময় মনে হয়েছে, মাথার ওপর আছে যেন বিরাট প্রতিভার চন্দ্রাতপ—তারই তলায়, তারই আশ্রয়ে নিরাপদ রয়েছি —শান্তিনিকেতনে পা দিলেই আমার যা' মনে হয়।

তা যাক গে রেড হর্স হোটেলের ঢাউস লাউঞ্জে বসে আমার গাইড মিস্টার ইভান্স বলছিলেন এই জায়গাটার অনেক কথা। সৌম্যদর্শন, উত্তর পঞ্চাশ এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা দুই বক্‌বক্ করে চলেছি।

ইভান্স বললেন, "এই স্ট্র্যাটফোর্ডের নামডাক সেক্সপীয়ারের জন্মস্থান বলে। খাঁটি কথা। কিন্তু এখানকার আরও অনেক আকর্ষণ আছে।

"কী রকম?"

"এই এলাকাটা হচ্ছে টিপিক্যালি ইংলিশ, একে বলা হয়, 'দি হার্ট অব ইংল্যাণ্ড'।

"ঠিক বলেছেন, অক্সফোড থেকে আসার পথে কী চমৎকারই না লাগছিল। সবুজ মাঠ, সোনালী ফসল, ঘন বন, অতিকায় অতিকায় দুর্গ এবং গির্জের পর গির্জে মোটর-রাস্তার দুধারে ছড়িয়ে আছে।"

"শুধু তাই নয়, এই যে হোটেলে আপনি উঠেছেন, তাও কম ঐতিহাসিক নয়।

ইভান্স চুরুট চিবোতে চিবোতে বলে চলেন—"শেক্সপীয়ার যখন বেঁচে ছিলেন এবং এই শহরেই থাকতেন, তখন থেকেই এই

হোটেলের নাম। তখন এদেশে ঘোড়ার গাড়ির যুগ। আসা যাওয়ার পথের ধারে সহিস আর ঘোড়সওয়ারের দল এখানে বিশ্রাম নিতেন। তার থেকেই হোটেলের নাম রেড হর্স—লাল ঘোড়া।

প্রথম চার্লস যখন রাজা তখন থেকে এর পরিচয়ের বিস্তার, আর জানেন তো এই হোটেলের আর একটি নাম 'ওয়াশিংটন আরভিং ইন।'

"কোন্ আরভিং? সেই মার্কিন লেখক?" আমি প্রশ্ন করি।

"হ্যাঁ, তিনিই"—ইভান্স জবাব দেন—"১৮১৫ সনে আরভিং এই হোটেলের একটি কোঠায় অনেকদিন ছিলেন এবং এখানেই তাঁর বিখ্যাত বই 'স্কেচ বুকের' অনেকখানি লেখা। ১৯৩০ সনে নতুন করে বানানো হয় হোটেলের বাড়িটা। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৫১ সনে আবার ঢেলে সাজানো হয়েছে সব। আগেকার চেহারা আর নেই।"

"তবে যে বললেন, আমার ঘরটাতে গ্যারিক ছিলেন?"—আমি প্রশ্ন করি।

"গ্যারিক এসেছিলেন এবং এই হোটেলেও উঠেছিলেন ঠিকই, তবে কোন্ ঘরে কেউ বলতে পারেন না। আপনার মনে রোমান্স জাগবার জন্যেই ওই কথা তখন বলেছিলুম"—ইভান্স হাসতে হাসতে বলেন—"চলুন, অনেক রাত হল, এবারে শুতে যাওয়া যাক। আচ্ছা, গুড নাইট।"

আগে চিড়িয়াখানায় লোক যেত দুবার। একবার বাবার হাত ধরে, ছেলের হাত ধরে আরবার। এখন দিনকাল পালটেছে, পালটেছে চিড়িয়াখানার চেহারা, বান্ধবীর হাত ধরে তৃতীয়বার ঘুরে এলেও কেউ অরসিক বলবে না।

হিন্দুস্থান যেমন আর শুধু হিন্দুর আস্তানা নয়, খৃস্টান-মুসলমান-শিখ-পারসিকেরও, তেমনি আদত অর্থ যাই থাকুক, চিড়িয়াখানা আজকাল 'চিড়িয়া' ছাড়াও তাবৎ জীবজন্তুদের ঠাঁই। ফাউ হিসেবে মেলে ফুল আর লতাপাতার 'মাই-ডিয়ারী' পরিবেশ। গাছের ছায়ায় দু দণ্ড বিশ্রাম নাও, কেয়ারি-করা ফুলের বাগানে টুঁ মারো এবং ফাঁকে ফাঁকে মোলাকাত কর গণ্ডা গণ্ডা গণ্ডার আর বাঘ-সিংহ-হাতীর সঙ্গে। মিনিট ঘণ্টা কেমন তরতর করে পালিয়ে যাবে, টের পাবার জো থাকবে না।

হালে আরও মজা। খাঁচার দিন শেষ। ধীরে ধীরে জীবজন্তু-দের—তা যত হিংস্রই হোক না কেন—ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে কৃত্রিম তৈরি খোলা জায়গায়। তারা সেখানেই গজরায়, সেখানেই দাপা-দাপি করে এবং কটমটিয়ে তাকায় দূরের মানুষগুলোর দিকে। 'দাও ফিরে সে অরণ্য' বলে শহুরে যাঁরা ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন, তাঁরা বনবাদাড় আর গুহায় তৈরি এই আরণ্যক শোভার মাঝখানে বাঘ-সিংহের অকুতোভয় পদচারণা দেখে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করেন। আর কাচ্চাবাচ্চাদের কথা তো আলাদাই। গোটা চিড়িয়াখানা তাদের কাছে এক আশ্চর্য রূপকথা।

নদীর সেরা গঙ্গা, পাহাড়ের সেরা হিমালয়, তেমনি চিড়িয়া-

খানার সেরা 'হাগেনবেক'। সম্প্রতি জার্মানীর যেখানে যত চিড়িয়াখানা আছে সেখানে কার্ল হাগেনবেক-এর তিরোধানের পঞ্চাশ বছর-পূর্তি উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সবাই স্মরণ করেছেন।

হামবুর্গে যখন যাই, গাইডকে বলি, দুটো জিনিস আমায় দেখাতে হবে। ছোটবেলা থেকে শোনা সেই 'এলব্-টানেল'—এলব্ নদীর পাতালপুরীতে চলাচলের সুড়ঙ্গ, আর দুনিয়ার বাড়া 'হাগেনবেক' চিড়িয়াখানা। গাইড পিটার ভিল বললে—তথাস্তু।

বলা দরকার, চিড়িয়াখানাটির নাম তার প্রতিষ্ঠাতা কার্ল হাগেনবেকের নামে। ইনিই আধুনিক 'জ্যু-বাগানের' জনক। ইনিই খোলা আরণ্যক পরিবেশে জীবজন্তুদের ছেড়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেন, রূপ দেন এবং সব জায়গাতে তাঁর পরিকল্পনাই একে একে চালু হচ্ছে। আমাদের আলিপুর চিড়িয়াখানাতেও তাই। সেখানে ইদানীং গুটিকতক সিংহ-সিংহী খাঁচার বাইরে। তবে হাগেনবেক আর আলিপুরে আশমান-জমিন ফারাক। একটির তুলনায় আরটি হাতীর কাছে পিঁপড়ে।

ভিল নিয়ে গেল শহরের উপকণ্ঠে। মাইলের পর মাইল জোড়া বিরাট এই হাগেনবেক চিড়িয়াখানা এবং খোলামেলা বনজঙ্গলের ভেতরে বাদ পড়েছে হেন একটিও জীবজন্তু নেই। হাঁটতে হাঁটতে ঘুরতে ঘুরতে আমি হয়রান, ভিলকে বলি, "আর পারি নে"। ভিল বলে—"আখ্ সো", অর্থাৎ তাই নাকি, তা হলে চল বাইরে যাই, সদর ফটকের সামনে গিয়ে খানিক বসি।

দু গেলাস 'ট্রাউবেন জাফ্ট্' অর্থাৎ আঙুরের রস নিয়ে দুজনে বসলাম। আর কোথাও নয়, চিড়িয়াখানার প্রবেশপথের সামনে, ঠিক যেখানটায় প্রতিষ্ঠাতা কার্ল হাগেনবেকের মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে।

খানিক জিরিয়ে ভিলকে বললাম, "কার্ল হাগেনবেক সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। জানতো কিছু বল।"

ভিল জবাব দেয়, "না জেনে উপায় আছে। গাইডের কাজ করছি বাবা গত পাঁচ বচ্ছর, তোমাদের তো চিনি। প্রশ্নের পর প্রশ্নে জ্বালিয়ে মারবে, তাই আগেভাগে তৈরি হয়ে নিই। আজ তৈরি। কার্ল হাগেনবেক এখন আমার ঠোঁটের ডগায়।"

ক্লান্ত পা দুটিকে ছড়িয়ে আমি উত্তর জার্মানীর মিঠে রোদ উপভোগ করছি। ভিল তোতাপাখির মত হাগেনবেক-চরিত ততক্ষণে শুরু করে দিয়েছে।

কার্ল হাগেনবেকের বাড়ি এই বন্দরী শহর হামবুর্গের কাছেই। জন্ম ১৮৪৪ সালে, মারা যান উনষাট বছর বয়সে ১৯১৩ সালে।

বাবা গট্‌ফ্রীড ক্লাউস হাগেনবেক ছিলেন মাছের বড় কারবারী। ১৮৪৮ সালে গট্‌ফ্রীডের একজন জেলে এলব নদীর খাড়িতে মাছ ধরতে গিয়ে পাকড়াও করে ছটি অতিকায় সীল। বাহাদুর সেই সীল মাছগুলোকে সে জমা দিল হুজুরের কাছে।

গটফ্রীড মাছের আকার দেখে তাজ্জব। বাপ রে, এত বড়! চটপট তাঁর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। দুটি বড় কাঠের চৌবাচ্চায় মাছগুলোকে ছেড়ে তিনি হামবুর্গের স্পীলবুডেন প্লাৎস-এ নিয়ে এলেন। আট সেন্ট দক্ষিণা দিয়ে হাজার হাজার লোক আসে সেই সীলগুলো দেখতে এল। এবং সেই দিন থেকেই দুনিয়া-জোড়া জীবজন্তু-ব্যবসায়ের সূত্রপাত এবং বলা যেতে পারে, হাম-বুর্গের এই অতি-বিখ্যাত জু-বাগানের শুভ সূচনা।

কার্ল হাগেনবেকের বয়স যখন একুশ, তাঁর বাবা গট্‌ফ্রীড জানতে চাইলেন, ছেলে কোন্ লাইনে যাবে। মাছের কারবার, না পশুপাখি সংগ্রহে? কার্লের উত্তর স্পষ্ট—দ্বিতীয়টিতে।

তার কারণ অবশ্য আছে। কার্ল ইতিমধ্যেই অ-বোলা পশু-পাখিদের কাছে মন বিকিয়ে দিয়ে ফেলেছেন। তাঁর সময়

কুকুর, বেড়াল, গিনিপিগ, ইঁদুরছানার সঙ্গে। জলে হাঁস দেখলেই নিজে নেমে পড়েন, আদরে গলা জড়িয়ে ধরেন। পাখি উড়ে এলে খাবার নিয়ে এগিয়ে যান, বই ঘেঁটে ঘেঁটে অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রাণীদের খবর আনেন। তাঁর বয়স যখন চার, তখনই কোথা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসেন আট আটটি ইঁদুর ছানা। মা দেখেই আগুন। ছেলেকে ধমকে ছানাগুলোকে দিলেন ছেড়ে। কিন্তু এদিকে ছেলের কান্না আর থামে না। ওই ইঁদুরছানা তার চাই-ই চাই। শেষমেষ বাবা গটফ্রীড নিয়ে এলেন তুলতুলে কতকগুলো গিনিপিগ। ছেলে শান্ত হল।

সেই কার্ল হাগেনবেক বড় হয়ে শেষ পর্যন্ত পশুপাখি সংগ্রহের ব্যবসায়ে নামলেন। গোড়ার দিকে যোগাড় হল ভাল ভাল হাঁস ছুঁচো বাঘ ভালুক হাতী ইত্যাদি। বিক্রির জন্যে আসে, কিন্তু যতদিন না হাতবদল হচ্ছে, জমা থাকে হাগেনবেক সংগ্রহশালায়। কার্ল ঠিক করলেন, এদের খানিকটা শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া দরকার, মানুষের মত কিছু কায়দা-কানুন রপ্ত করানো দরকার। এদের সঙ্গে মিশে থাকতে হলে এদের হাবভাবের ভাগীদার হতে হবে। তা ছাড়া, পশুপাখিকে বশ মানানো যে কার্লের জীবনে একমেব আনন্দ।

কারবারে গোড়ার দিকে বেশ লোকসান গেল। তবে কয়েক বছরের ভেতর দু পয়সা ঘরে আসতে লাগল। কার্ল উৎসাহিত হলেন। সংগ্রহের বিস্তার ঘটল, নানা জাতের, নানা রকমের পশুপাখি ভিড় বাড়াল। খ্যাতি এত দূর গড়াল যে, জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার রাজারা, রুশ দেশের জার, জাপানের মিকাডো, মরক্কোর সুলতান হাগেনবেক সংগ্রহশালা থেকে জীবজন্তু কিনতে লাগলেন। ১৮৮৭ সালে ব্যবসার খাতিরে কার্ল খুলে বসলেন বিখ্যাত সেই 'হাগেনবেক সার্কাস'—পশুপাখির তাক লাগানো খেলা যার বৈশিষ্ট্য। সার্কাস ঘুরল সারা পৃথিবী। আমাদের ভারতবর্ষেও এসেছে একবার।

১৮৯৬ সালে আর এক ধাপ অগ্রসর। বার্লিনের ইম্পিরিয়েল পেটেন্ট অফিস কার্ল হাগেনবেককে একটি নতুন পেটেন্ট দিলেন। তাতে তিনি অধিকার পেলেন খোলা মাঠে কৃত্রিম গুহা-জঙ্গলে নির্বীতংস 'জু-বাগান' বানাবার। এবং আধুনিক চিড়িয়াখানার জন্ম ঠিক সেইদিন থেকেই। প্রাণপ্রিয় পশু-পাখিদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার আনন্দে কার্ল হাগেনবেক সেদিন আত্মহারা।

তারপর চলল গবেষণা, কীভাবে ওদের স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া যায়। দর্শকদের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব রেখেও যাতে ওরা দৌড়ঝাঁপ করতে পারে, অরণ্যের সাড়া পায়, তার জন্য কার্লের সে কী প্রাণপাত পরিশ্রম। অবশেষে তাঁর সাধনা সফল হল। ১৮৯৭ সালে কার্ল কিছু জমি দখল করলেন এবং সেইখানেই প্রতিষ্ঠা হল বিশ্ববিখ্যাত হাগেনবেক চিড়িয়াখানার।

ভিল খানিক দম নিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল—"তামাম-শুদ। চল, এবারে যাওয়া যাক। বিকেলে আবার যেতে হবে ল্যুবেক—টমাস মানের শহরে।" রওনা হতে হতে ভিল আবার বলে—"আর হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, কার্ল হাগেনবেকের ছেলে হাগেনবেক জুনিয়ারও একজন নাম-করা পশুপক্ষিবিদ। চিড়িয়াখানার আধুনিকীকরণে এই জুনিয়ারেরও দান কম নয়।"

আমি বললাম—"সে আমি জানি। আমাদের দিল্লির চিড়িয়াখানার পরিকল্পনায় ওঁর হাত আছে। ১৯৫৬ সালে তিনি আসেন উপদেষ্টা হয়ে এবং তাঁরই নির্দেশমত পুরান কিল্লার কাছে তৈরি হয়েছে খোলামেলার চমৎকার জ্যুলজিকেল গার্ডেন।"

ভিল বললে—"তাই নাকি? এ খবর কিন্তু আমার জানা ছিল না। দিল্লি যদি কোন দিন যাই, তুমি তা হলে আমার গাইড হয়ো। কেমন, রাজী?"

যদি কোন দিন মিউনিক যান, লিণ্ডারহোফ কাসল দেখে আসতে ভুলবেন না। জার্মান দেশ সফরের গোড়াতেই আমি লিণ্ডার-হোফ দুর্গে পাড়ি দিই, পাহাড়ের বুকে কারুকার্যের অমন মহিমা দেখে বিস্ময়ে অবাক মানি।

দুর্গটি মিউনিক থেকে বেশী দূরে নয়। ওবেরামারগাউ আর এটাল মঠ পেরিয়ে সোজা চলে যাওয়া যায়। যে-কোন একটি দিনের ভোরে চওড়া হাইওয়ে বরাবর একটার পর একটা হ্রদের কোল ঘেঁসে ছুটলেই লিণ্ডারহোফ্—আল্পসের কোলের তাজমহল।

এঁকে-বেঁকে চড়াই ডিঙোতেই হঠাৎ সামনে আলোর ঝলকানি। পেঁজা তুলোর মত বরফ ঝরে পড়ছে ফার আর দেওদার গাছের ডালে, পাতায়। তারই মাঝখানে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে এক অতিকায় রাজপ্রাসাদের চুড়োয়। গাইড বললেন— "হ্যাঁ, এটাই লিণ্ডারহোফ, পাগলা রাজা দ্বিতীয় লুডভিগের একক সন্ন্যাস জীবনের আলয়।"

দ্বিতীয় লুডভিগ বাভারিয়ার তখ্‌তে বসেন ১৮৬৪ সালে। তখন তাঁর বয়স উনিশ। বাস্তব জীবনের ধূসরতা দূরে ঠেলে বছরের পর বছর তিনি কল্পনার জাল বুনে চলেন। তখ্‌তে বসেই ঠিক করে ফেললেন, 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।' সব ছেড়েছুঁড়ে তিনি ঠাঁই নেবেন কোন নিঃসঙ্গ-নিকেতনে।

লুডভিগের বাবা দ্বিতীয় মাক্সমিলিয়ন আল্পসের গ্রাসভাং উপত্যকায় লিণ্ডার পরিবারের নাম দিয়ে একটি ছোট বাড়ি কিনেছিলেন শিকারের জন্যে। তাঁর বাড়িটার নাম দিয়েছিলেন

'লিণ্ডারহোফ'। দ্বিতীয় লুডভিগ স্থির করেন, এইখানেই তিনি এক দুর্গ বানাবেন, জীবনের বাকি ক'টা দিন এই নিভৃত উপবনেই কাটিয়ে দেবেন।

রাজার যখন বয়স তেইশ, দুর্গ বানানোর কাজে হাত দিলেন। পয়লা পাঁচ বছর কেটে গেল নক্সা বাছাই করতেই। শেষমেষ ডাকা হল নাম করা স্থপতি ডলমানকে। ঘরের ভেতরের কারুকার্যের ভার নিলেন কোগাগালিও, ইয়াংক, ছলাপে প্রমুখ কয়েকজন শিল্পী। বাগান বানাতে হাত দিলেন সে-যুগের ডাকসাইটে উদ্যান-শিল্পী ফন এফ্‌নার। বাইজেনষ্টাইন, ফরাসী এবং বারোখ রীতিতে খোদাই, ঢালাইয়ের কাজ সেরে এবং ইরাণ, মিশর, ভারত, জাপান, ইতালি, ফরাসী ইত্যাদি নানা দেশের শিল্পসম্ভার উজাড় করে এনে তিলোত্তমার মত এক আশ্চর্য মহিমান্বিত ভবন তিনি নির্মাণ করলেন আল্পস পর্বতের চুড়োতে।

প্রথম ঘরটাতে ঢুকতেই সোনার কাজ করা ঢাউস একটা পিয়ানো। গাইড বললেন, "এটাতেই রাজার বন্ধু ভাগনার সুরের ইন্দ্রজাল বুনতেন।"

যে-ঘরেই ঢুকি, চোখ ধাঁধিয়ে যায়। উপর-নীচ, ডান-বাম সকল দিকেই বিলাস-ব্যসনের ছড়াছড়ি। সঙ্গী গাইডের মুখে ফুলঝুরি, "এইটে বার্মা থেকে, এই আতরদান ভারত থেকে, এই ময়ূরপঙ্খী সিংহাসন ইরাণ থেকে, এই আলোর ঝালর ব্রুসেলস থেকে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

একতলা, দোতলায় অসংখ্য ঘরের গোলকধাঁধাঁ পেরিয়ে আর একটু উপরে মূরিশ কিয়োস্ক। একা আল্পসের দিকে অপলক চোখ মেলে রাজা লুডভিগ এই ছোট্ট কারুকার্যমণ্ডিত ঘরটিতে বসে থাকতেন, অলস-ঔদাস্যে ধূমপান করতেন কিংবা মদের বাটি ঠোঁটে তুলে ধরতেন।

কিয়োস্কের কিনারেই গুহাগৃহ—ভেনাসের 'গ্রোটো।' আরব্য-

রজনীর আলাদিনের মত প্রস্তরীর চিচিংফাঁকে বড় পাথরের টুকরো হঠাৎ সরে যায় এবং সরু গলি বেয়ে অন্ধকার গুহার ভেতরে ঢুকতেই অন্য জগৎ।

গোটা জিনিসটাই কৃত্রিম। এবং আলো ফেলতেই ভোজ-বাজি। চারধারে পাথরের দেয়ালে শিল্পকাজ এবং অপেরামঞ্চের অনুকরণ এককোণে। মঞ্চের সামনেই ছোট্ট লেক। তার নীল জলে পাল তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাদা নৌকো। সব দেখে শুনে মাথা খারাপ হবার জোগাড়। সঙ্গী মার্কিণ-দম্পতিটি ডুয়েটে চীৎকার পাড়লেন, 'এক্সকুয়্যাইজিট— !'

গুহাগৃহ থেকে বেরিয়ে আমার মন তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছিল অতীত ইতিহাসের পাতায়। ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছিলুম নেপচুন-ফাউন্টেনের দিকে। আর ভাবছিলুম দ্বিতীয় লুডভিগকে। এই রোজ ক্যাবিনেট, এই হল অব মিরার, এই ওয়েস্ট গোবেলিন চেম্বার সব ঘরেই তো বিলাসিতার চূড়ান্ত। তবে কেন মিউনিকের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এখানে তিনি চলে এসেছিলেন? কেন? মনের শান্তি, নিঃসঙ্গতা? নাকি অন্য কোন বিরহ-বিষাদ?

গাইডকে প্রশ্ন করেছিলুম। ঠিক ঠিক জবাব দিতে সে পারে নি। শুধু বলেছিল—"ওই পাগলা রাজার খামখেয়ালিপনার কথা আর বলবেন না। গুচ্ছের টাকা উড়িয়েছেন আজেবাজে কাজে। তাঁর বন্ধুটিও জুটেছিল তেমনি। হ্যাঁ, সংগীতশিল্পী ভাগনারের কথাই বলছি। ওর পেছনে রাজা কম টাকা ঢেলেছেন!"

আমাদের কথা শুনে এক টুরিস্ট মার্কিন মেজর এগিয়ে এল। বলল,—"আমার মনে হয় রাজা ব্যর্থপ্রেমিক, নইলে এখানে চলে আসবেন কেন?"

"বাঃ রে, তা কেন হবে"—আমি জবাব দিই—"উনবিংশ শতাব্দীর রাজা, একটা গেলে পাঁচটা মেয়ে জোটে। তাঁর এত বৈরাগ্য হবে কেন? তা ছাড়া বৈরাগ্যই বা বলি কী করে। লাখ লাখ

টাকা খরচের যে নমুনা দেখলুম, তাতে একবারও মনে হয় না, রাজাবাহাদুর বিবাগী ছিলেন।"

আমাদের আলাপ আলোচনায় তিতিবিরক্ত গাইড বললে—"বললামই তো মশাই, ওঁর মাথায় ছিট ছিল! নইলে বনে-বাদাড়ে কেউ এত টাকা ওড়ায়। প্রেম ট্রেম কিসসু নেই।"

গাইড চলে গেল। মার্কিন মেজরও ক্যামেরা বাগিয়ে ছুটল ফোয়ারার দিকে। আমি মনে মনে বললুম: প্রেমিক না হলে এমন তাজমহল কেউ বানাতে পারে! বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি? না সেও তো হতে পারে না! হলে বিলাস ব্যসনের এত ছড়াছড়ি কেন?

প্রশ্নের উত্তর পেলুম ফেরার পথে। এক বুড়ো জার্মান বীয়ারের গ্লাসে চুক্‌চুক্ চুমুক দিচ্ছিল পাশের রেস্টুরেন্টে বসে। আলাপচারী হতেই একথা সেকথা। এবং তৎক্ষণাৎ আমার সেই জিজ্ঞাসা।

বুড়ো বললে—"রাজা ছোটবেলা থেকেই বিবাগী। উনবিংশ শতাব্দীর নতুন যন্ত্র-সভ্যতা তাঁকে পীড়া দিয়েছে, তাঁর মনে হয়েছে, কলকারখানা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে মারছে। তাই শহরে মন টেঁকে নি। পাগলের মত ছুটে বেড়িয়েছেন শান্তির সন্ধানে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে। রাজাকে সবাই 'পাগল' বলে। কারণ তিনি যুগের সঙ্গে তাল মেলান নি। তাঁর মন বরাবর ঘুরে বেড়িয়েছে কল্পনার জগতে। সেই কল্পনাকেই রূপ দিয়েছেন এই লিণ্ডারহোফে। এমন জায়গা তিনি বেছে নিয়েছেন, যেখানে চিমনির ধোঁয়া পৌঁছায় না, কলের আওয়াজ কানে তালা লাগায় না, লৌহদন্ত বিস্তার করে কারখানা হানা দেয় না। এমন রাজা ইতিহাসে দুর্লভ।

বৃদ্ধের উত্তর আমার মনের আর একটা দরজা খুলে দিল। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যন্ত্র-সভ্যতার পীঠস্থান জার্মানীতে এসে এ কোন্ কাহিনী আমি শুনলুম?

কিন্তু রাজা দ্বিতীয় লুডভিগ কি বর্তমান ইউবোপে একক? বোধ হয় না। পশ্চিম ইউরোপের শহরে গ্রামে ঘুরে অজস্র লোকের সঙ্গে কথা বলে টের পেয়েছি, প্রায় প্রত্যেকের মনে দ্বিতীয় লুড-ভিগ বাসা বেঁধেছে। সকলের মনেই প্রশ্ন, যন্ত্র-সভ্যতার দানে সমৃদ্ধ আমরা কোন্ পথে চলেছি? এ পথের শেষ কোথায়?

তাঁদের প্রশ্নের উত্তর আমার দেবার কথা। কারণ আমি ভারতীয়—বিপরীত কোটির মানুষ। কিন্তু কোন জবাব দিতে পারি নি। স্বাধীনতা লাভের পর ইদানীং আমরাও যে ওই একই পথের পথিক।

বন থেকে বেরোল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। টিয়ে হাতে যিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁর মাথার টোপর টাকের।

চেরাপুঞ্জির সার্কিট হাউসের ঢাউস বারান্দায় ডেক-চেয়ার পেতে বসে আছি, আর হিমের কুঁড়ি ইলশেগুঁড়ির নাচ দেখছি। এমন সময় সামনের ঝোপ থেকে ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। যেন কুমোরবাড়ির আধাতৈরি পুতুল। মুখের আদলে এদিক-সেদিক করা বাকি। ভদ্রলোকের চুল, ভুরু বেমালুম উধাও। কপাল মাথা মিলে গড়ের মাঠ। চোখের 'সকেটে' পোয়াটাক তেল রাখা যায় এবং হঠাৎ-ঢালু তোবড়ানো গাল দুটোতে গলাগলি—থুড়ি 'গালাগালি' হচ্ছে হর্‌বখত্‌। আর নাক? যেন চার আনা দামের সিঙ্গাড়া। পরণে শার্ট প্যান্ট, পায়ে একপাটি জুতো, হাতে পোষা টিয়ে পাখি। বয়স সত্তর পেরিয়ে। ইনিই ডক্টর কোয়েলৎস্ মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো।'

বর্ষণক্লান্ত চেরাপুঞ্জির নির্জন সার্কিট হাউসে এই সময়ে এক বঙ্গসন্তান পরম নিশ্চিন্তে বসে আছে দেখতে তিনি বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন না। একটু অবাক হলেন। ভরতনাট্যমের ভঙ্গিতে হাড়গিলে-গলা হঠাৎ এগিয়ে দিয়ে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর নেংচাতে নেংচাতে কাছে এসে হাজির।

উঠে দাঁড়ালুম। 'হ্যালো'—বলে বরফ-ঠাণ্ডা ডানহাতটা এগিয়ে দিলেন। পরিচয় দিলুম। বাঁ হাতের দাঁড়ে বসে-থাকা টিয়ে-পাখির গায়ে ডান হাত বুলোতে বুলোতে কোয়েলৎস নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন—"বছর দুই আছি আসামে—নাগাপাহাড় গায়ে

পাহাড়, শিলঙ, চেরাপুঞ্জি—এই চলছে। এই সার্কিট হাউসে আছি কয়েক মাস। কাজ? সে অকাজের কাজ। পাখি জোগাড় করা।"

আমি মনে মনে ভাবি, পাখি জোগাড় করা? সে আবার কী কাজ? এই ভদ্রলোকের নামও শুনি নি তো কোনদিন?

আমার সঙ্গী বিল স্মল এই সময় বেরিয়ে এল কোণের ঘর থেকে। বিল বিশ্বভারতীর মার্কিন ছাত্র। দু'জনে শিলঙ থেকে চেরাপুঞ্জি বেড়াতে এসেছি। বিলের সঙ্গে ডক্টরের পরিচয় করিয়ে দিলাম, এবং হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বিলের সঙ্গে ইংরেজী বলতে বলতে এবং 'এটা কি', 'সেটা কি' ইংরেজীতে বোঝাতে বোঝাতে আগেই হাঁপ ধরে গেছে। ডক্টর কোয়েলৎসের সঙ্গেও আর এক দফা ইংরেজীর কসরৎ।

বিল একজন পাকা বাক্যবাগীশ, ডক্টরও কম যান না। দু'জনে পাল্লা দিয়ে কথার দৌড় চালাল। আমি মাঝে মাঝে হুঁ, হাঁ, করি।

জানা গেল, ডক্টর কোয়েলৎস্ জাতে জর্মন। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। বাঘা পণ্ডিত। পাখি সংগ্রহ করা তাঁর কাজ। পাখিদের নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন, বহু বইও লিখেছেন। ইদানীং সংযুক্ত আছেন মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। মধ্যপ্রাচ্যে পাখি সংগ্রহের কাজে ছিলেন প্রায় কুড়ি বছর। নানান রকম পাখির নমুনা জোগাড়ে তিনি জীবনপাত করছেন। নানা দেশ ঘুরে এখন এসেছেন চেরাপুঞ্জি—আসামের দুষ্প্রাপ্য পাখি সংগ্রহের কাজে। 'পক্ষীরাজ' কোয়েলৎসের সঙ্গে হঠাৎ এমনিভাবে সার্কিট হাউসে দেখা হয়ে যাবে, আমরা ভাবতে পারি নি।

ডক্টর বললেন—"টেক্ রেস্ট, আমি একটু আসছি। আর হ্যাঁ, আজ রাত্রে আপনারা দু'জন আমার গেস্ট। সার্কিট হাউসের খানসামা চমৎকার চিকেনকারি রাঁধে।"—আমি কিছু বলার আগেই বিল ঘাড় নেড়ে দিয়েছে। ডক্টর তাঁর ঘরে ঢুকে গেলেন।

বিলকে বললুম—"এত চটপট নেমন্তন্নটা নেওয়া কি ঠিক হল?"

"কেন ঠিক হবে না"—বিল গজরায়—"পরের পয়সায় চিকেন-কারি খাওয়াটা এমন কি মন্দের? মুরগীও খেলাম, পয়সাও খরচ হল না, এমন সৌভাগ্য ক'দিন আর জোটে"—

বিল স্মল সম্পর্কে একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। এই ধরনের বিদেশী ছাত্র শান্তিনিকেতনে কদাচিৎ এসেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিল ছিল সৈনিক। যুদ্ধশেষে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূবিদ্যায় বি-এ পাশ করে। সম্পন্ন ঘরের ছেলে।

১৯৫০ সালের কথা। ভগ্নীপতির সঙ্গে নিজের গাড়িতে লং-ড্রাইভে বেরিয়েছে। দুর্ঘটনায় গাড়ি ভেঙে চুরমার। বীমা কোম্পানী থেকে বিল পেল প্রচুর টাকা। সেই টাকায় চলে এল ভারতবর্ষে। ১৯৫১ সালে। ভারতবর্ষে আসার শখ ছিল তার অনেক দিন।

ভারতে এসে ঘুরতে ঘুরতে একদিন শান্তিনিকেতনে। জায়গাটা ভাল লেগে গেল। ব্যস, অন্য প্রোগ্রাম বাতিল করে ভর্তি হয়ে গেল বিদ্যাভবনে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে এম-এ কোর্সে।

বিশ্বভারতীর অন্য দশজন বিদেশী ছাত্র ও অধ্যাপকদের মত বিল স্মলও কোটপ্যান্টের খোলস ছেড়ে রাতারাতি পাজামা পাঞ্জাবি ধরল। পা থেকে জুতোজোড়াও খুলে ফেলল। আর 'কুব বালো', 'আচ্ছা মসায়',—এই দুটো বাংলা কথা পুঁজি করে শিশু-বিভাগের ছোট ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মেরে বেড়াতে লাগল।

বিল কিন্তু বাঙালীপনায় এগিয়ে গেল আর এক ধাপ। ঘরে নিয়ে এল এক খানদানি গড়গড়া। সিগারেটের বদলে গড়গড়ায় গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানে, হোস্টেলের বারান্দায় খালি গায়ে লুঙ্গি পরে ঘুরে বেড়ায়, গ্রামে গ্রামে চক্কর মারে, খিচুড়ি, মালপো পাঁচ আঙুলে চেটেপুটে খায়।

সেই বিল স্মল ১৯৫২ সালের গরমের ছুটিতে আমার সঙ্গে শিলঙ

বেড়াতে এল। উঠলুম আমার এক কাকার বাড়িতে। বাড়িতে এসেই বিল বলল—"আমার জন্যে নো স্পেশাল অ্যারেঞ্জম্যাণ্ট। তুপুরে ডাল ভাত মাছ, সকালে তুধ মুড়ি কিংবা লুচি আলুর দম, রাত্তিরে মাছ মাংস ডিম যা খুশি, পুঁই ডাঁটার চচ্চড়ি হলেও আপত্তি নেই; তবে রিমেম্বার, নট ছ্যাট হিল্‌সা ফিশ। উফ্, ছ্যাট কাঁটা বিজনেস্ ইজ্ হরিব্‌ল্!"

শিলঙ থেকে তুজনে একদিন বাসে চড়ে চেরাপুঞ্জি হাজির। বাসের পেছনে মালের ঝুড়ি, সামনে জনা আষ্টেক প্যাসেঞ্জার। পাইপ মুখে খাশিয়া ড্রাইভার এক একটা মরণ-বাঁক পেরোয় আর আমরা হাজার ফুট খাদের নীচে গড়িয়ে পড়া মৃত্যুর হাত থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে বাঁচি।

চেরাপুঞ্জি পৌঁছে শুনি, ফেরার বাস নেই। পরদিন সকালে শিলঙ যাবার বাস। কী সর্বনাশ! কোথায় রাত কাটাই তাহলে? টিপির টিপির বৃষ্টি আর সড়াক্ সড়াক্ হাওয়ার ফলা—এর মাঝখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলবে কোথায়? এমন জানলে তো অন্য বন্দোবস্ত করা যেত! মুশ্‌মই জলপ্রপাত আর চেরাপুঞ্জি-ভোলাগঞ্জ রোপওয়ে দেখে যখন বাজারের কাছে এলুম তখন বিকেল চারটা। খুঁজতে খুঁজতে পেলুম সার্কিট হাউস। সেখানেই ডক্টর কোয়েলৎসের সঙ্গে দেখা।

ডক্টর কোয়েলৎস তাঁর ঘরে আমাদের নিয়ে এলেন। ঘরের ভেতর ইতস্তত ছড়ানো সরু মোটা বই, কাগজপত্র। আর নানান রকম পাখির নমুনা। অদ্ভুত অদ্ভুত কত পাখিকে যে মরা পড়ে থাকতে দেখলাম, তার সীমা সংখ্যা নেই।

এককোণে বসে আছে রূপচাঁদ—ডক্টরের সহচর। রূপচাঁদ জাতে পাঞ্জাবী। ডক্টরের সঙ্গে সঙ্গে আছে বহু বছর। তাঁর সঙ্গে তু'বার আমেরিকাও ঘুরে এসেছে। দেখলুম, মেঝেতে বসে রূপচাঁদ মরা পাখির ভেতরকার হাড়গোড় মাংস নরুণ দিয়ে বের করছে,

ভেতরে তুলো পুরছে, আর বাইরের খোলসটা ঠিক ঠিক রেখে তুলো ভর্তি পাখিকে সুতো দিয়ে বাঁধছে। হাজার হাজার পাখির পাহাড় জমা হচ্ছে পেছনের কুঠরী ঘরে।

ডক্টর বললেন—"চমৎকার লোক এই রূপচাঁদ। ও না থাকলে আমায় অনেক অসুবিধায় পড়তে হত।"

রূপচাঁদ মুচকি মুচকি হাসে আর সুতো বাঁধার কাজ মেসিনের মত চালিয়ে যায়।

ডক্টর বললেন—"এই পাখিগুলো নিয়েই আমার গবেষণা, পাখির পাহাড় চালান হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায়। পাখি সম্পর্কে গবেষণার কাজও চলছে। এখান থেকে টাইপ করে প্রবন্ধ পাঠাই, বিশ্ববিদ্যালয় ছাপার ব্যবস্থা করে। এই চলছে গত তিরিশ বছর।"

সার্কিট হাউসের চৌকিদার দুটো হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে এল। চেরাপুঞ্জিতে অন্ধকার নেমেছে। পাহাড় গাছপালা বন—সব ঝাপসা ঝাপসা। দূরে সিলেটের সমতলভূমি আর দেখা যায় না। শুধু ঠাণ্ডা হাওয়ার সরসরানি, বৃষ্টির নূপুরের ঝমর ঝমর।

ডক্টর বললেন—"চলুন, বারান্দাতেই বসি। তিনজনে তিন ডেক-চেয়ার টেনে বারান্দায় বসে পড়লুম। চারদিকে অন্ধকার। লণ্ঠনের মিটমিটে আলো কেমন যেন রহস্যময়। সেই আলোতে ডক্টরের মুখ আরও অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

জিগগেস করলুম—"এই পাখি সংগ্রহে লাভটা কী বলতে পারেন ?"

"লাভ ?"—ডক্টর ফোঁকলা দাঁতের হাসি ছড়িয়ে বললেন—"লাভ বিশেষ নেই। কৌতূহল মেটানো ছাড়া। এই পৃথিবীতে আমাদের পাশাপাশি যে-সকল জীবজন্তু বাস করছে, তাদের সম্পর্কে যত বেশী জানা যায়, ততই আনন্দ আর উৎসাহ বাড়ে। এবং এই জন্যেই অনেক দেশ কোটি কোটি টাকা খরচ করছে, লাখ লাখ পাখির খোলস সযত্নে রাখা হচ্ছে।"

ডক্টর একটু দম নিয়ে আবার বললেন—"তাছাড়া কোন কোন পাখি মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। যেমন ধরুন ধনেশ পাখি। ওষুধের কাজে লাগে। শস্য-রক্ষা ও ধ্বংসের কাজে অনেক পাখির নামডাক আছে। আর মানুষের খাদ্য হিসেবে তো অনেক পাখিই লাগছে।"

লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় দেখলাম, মানুষের খাদ্যের কথা শুনেই বিলের চোখমুখ চকচক করছে। আন্দাজ করতে পারি, তার সামনে তখন একটা আস্ত মুরগী কঁকর-কোঁ করে উঠেছে। চিকেন-কারির আর কত বাকী ?

তামসিক চিকেন-কারির কথা ভুলে আমি সাত্ত্বিক কবিতার রাজ্যে এলাম। মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল জীবানন্দ দাসের কবিতা—'হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে তুমি আর কেঁদ নাকো উড়ে উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে—

ডক্টর বললেন—"বেঙ্গলি পোয়েট্রি ? দ্যাটস ফাইন।"

বিল চোখমুখ পাকিয়ে বললে—"ট্রান্সলেট ইট।"

কী সর্বনাশ! বিলটা আচ্ছা পাজী তো। ট্রান্সলেট করতে হবে জানলে কবিতাটা বলতামই না। চিল তো জানি 'কাইট' আর সোনালী ডানার চিলকে না হয় বললাম গোল্ডন উইংগড্ কাইট ; কিন্তু 'ভিজে মেঘের দুপুর' আর 'ধানসিঁড়ি নদী ?' তার ইংরেজি ? ইমপসিব্‌ল্। বেগতিক বুঝে ক্যাবলার মত হেসে বললাম—"আরে না, ওসব বাজে কবিতা, ট্রান্সলেট করার কোন মানে হয় না। আমি বলতে চাইছি যে, আমাদের বাংলা কাব্যেও অনেক পাখির নাম জড়িয়ে গেছে। যেমন কোকিল, চিল, বউ কথা কও, চোখ গেল, শালিক, দোয়েল, খঞ্জনা, ময়না, বাবুই।"

বিল বললে, "সব দেশের সাহিত্যেই তাই।"

ডক্টরও সায় দিয়ে বললেন—"আসলে কি জানেন, এমনিতে মনে

হয়, বেশীর ভাগ পাখিই কোন কাজে লাগে না ; কিন্তু এমন অনেক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দৃষ্টান্ত আছে—গোড়ায় যাদের কোন বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে কেউ ভাবতেই পারে নি, অথচ পরে আমাদের জীবনের প্রয়োজনে কত কাজেই না লেগেছ।"

"ভারতের পাখি সম্পর্কে কিছু বলুন"—বিল আর আমি দুজনেই প্রায় একসঙ্গে বলি।

ডক্টর একটা মোটা চুরুট ধরিয়ে শুরু করলেন।—"ভারতে পাখি সংগ্রহ হচ্ছে গত এক শ বছর ধরে। প্রায় এক লাখ পাখির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তার কিছু আছে কলকাতার যাদুঘরে। কিন্তু ভারতীয় পাখির বৃহত্তম সংগ্রহ লণ্ডনে। এই সংগ্রহ সম্পর্কে লেখা বই আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি।"

"বইটা কার লেখা"—বিলের প্রশ্ন।

"শুনে অবাক হবেন, বইটা লিখেছেন এক পুলিস অফিসার—আসামের ভূতপূর্ব পুলিসী বড়কর্তা মিস্টার স্টুয়ার্ট বেকার। বেকারের মত লোক অবসর-বিনোদন হিসেবে এই রকম অনেক কাজ করে উত্তরসূরীদের দারুণ উপকার করে গেছেন। আমার ধারণা—"

ডক্টরের কথা শেষ হতে না হতেই দুটো ছায়া এসে বারান্দার কাছে দাঁড়াল। আমরা চোখ তুলে তাকালাম। ছায়া ডাক দিল—'সাহেব।'

লণ্ঠন হাতে ডক্টর এগিয়ে গেলেন। আলোয় দেখলাম দুটি খাসিয়া যুবক। তাদের ঝুলিতে কয়েকটি পাখি। ডক্টর নেড়েচেড়ে পাখিগুলি রেখে দিলেন। কিছু পয়সা দিলেন দাম বাবদ। ওরা সেলাম ঠুকে চলে গেল।

ফিরে এসে ডক্টর আবার শুরু করলেন—"নিজে ঘুরে ঘুরে যেমন সংগ্রহ করি, তেমনি লোকেও পাখি দিয়ে যায়। পছন্দ হলে দাম দিয়ে কিনে নিই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমার ধারণা, ভারতে প্রায় এক হাজার শ্রেণীর পাখি আছে। আর আসাম আমার মত

পাখি জোগাড়েদের স্বর্গরাজ্য। ওই এক হাজার জাতের প্রায় সাত শ পঞ্চাশটির দেখা পাওয়া যায় এই আসামেই। তার কারণ আসামের বিশেষ ভৌগলিক অবস্থান এবং বিভিন্ন ধরনের বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য। সমতলভূমি, ঘাসজমি, পাহাড়ী জমি, গভীর জঙ্গল, নদনদী, হ্রদ এমন কি বরফঢাকা পর্বতচূড়াও আসামে আছে। আসাম হিমালয় অঞ্চলের প্রায় মাঝখানে আছে বলে পশ্চিম এলাকায় যে সকল পাখির বাস, তারা এখান অবধি ধাওয়া করে। আবার মালয়, ব্রহ্ম, কম্বোডিয়া থাইল্যাণ্ড দেশের পাখিগুলোও পূব দিক থেকে এখানে আসে। তাছাড়া এখানকার সর্বত্র প্রচুর জল, যাযাবর জলচর পাখিদের কাছে তো মক্কা-মদিনা। সুযোগ পেলেই ছুটে চলে আসে।"

আমি আর বিল নীরব শ্রোতা। ডক্টর একনাগাড়ে বলে চলেছেন—"নানা জাতের পাখির মধ্যে কোন কোনটি দেখতে অদ্ভুত, তাদের স্বভাবও বিচিত্র। ধনেশ পাখি চেনেন তো? ওই যে হাতির দাঁতের মত ইয়া ঠোঁটের বিরাট পাখি? আধ মাইল দূর থেকে তাদের উড়ে যাবার শব্দ শোনা যায়। এই ধনেশ পাখি আসামে আছে পাঁচ রকম। সবগুলি জঙ্গলে থাকে আর জংলী ফল খায়। আর একটি অদ্ভুত পাখি হাড়গিলা। হাড়গিলা দু রকমের। বড়টি দাঁড়ালে ৪।৫ ফুট উঁচু হয়। পাখার প্রসার প্রায় দশ ফুট। কিছুদিন আগে গৌহাটির কাছে ওই রকম প্রায় পঁচিশটা হাড়গিলাকে এক ঝাঁকে উড়ে যেতে দেখেছি।"

"হানি-গাইড আর এক রকম অদ্ভুত পাখি। এরা মৌমাছির উপর নির্ভরশীল। মোম ছাড়া কিছু খায় না। রঙ হালকা, আকার চড়ুই পাখির মত। এই পাখি আসাম ছাড়া আফ্রিকাতেও দেখেছি। হয়ত আফ্রিকা থেকেই এখানে এসেছে। আচ্ছা, আপনারা বাবুই পাখিকে তো চেনেন।—"

আমার চটপট জবাব—"চিনব না? খুব চিনি। কবিতায়ও পড়েছি—'বাবুই পাখিরে ডাকি কহিল চড়াই"—

বিল বলতে যাচ্ছিল—'হোয়াটস্ ছাট'। আমি এবার চোখ পাকিয়ে বলি—"ফের বিল। আগেই বলেছি না, নো ট্রানস্লেশান বিজনেস!" বিল মুচকি মুচকি হাসে।

ডক্টরের এদিকে খেয়াল নেই। তাঁর কথা তিনি বলেই চলেছেন। বোধহয় অনেকদিন পর কথা বলার লোক পেয়ে ঝুলি উজাড় করছেন। আমাদেরও শুনতে মন্দ লাগছিল না।

ডক্টর বললেন—"বাবুইর কথা বলছিলাম। বাবুইর সমগোত্রীয় আর একটা পাখি প্রায় ৭০।৮০ বছর আগে দেরাদুনে আবিষ্কৃত হয়। অনেকে ভেবেছিলেন, এই পাখির অস্তিত্ব বোধহয় লোপ পেয়ে গেছে। কিন্তু গত বছর গোয়ালপাড়ায় এই পাখি আবার দেখা গেছে। তবে এরা বাবুইর মত পাকা স্থপতি নয়। কিছু ঘাস টেনেটুনে যাচ্ছেতাই বাসা বানায়।"

"পৃথিবীর দুষ্প্রাপ্যতম একটি পাখির কথা বলি। এদের নাম 'পিগ্‌মি ফ্লাইক্যাচার', ক্ষুদে মক্ষিকাভুক। এদের রঙ নীল, কখনও কখনও উজ্জ্বল কমলালেবুর রং। আর একটা দুষ্প্রাপ্য পাখি 'ক্যালিন'। অনেক আগে সিকিমে দেখা গিয়েছিল, আর দেখতে পাই না। মাত্র কিছুদিন আগে নাগা পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে 'ক্যালিন' পাখি নজরে পড়ে। তাছাড়া আরও কত অজস্র পাখি আছে, যারা ঝোপেঝাড়ে, বনেবাদাড়ে লুকিয়ে থাকে, তাদের কথা কোন বইয়েই লেখা হয় নি। হয়ত একদিন লেখা হবে। কাজ চলছে। সেই কাজের নেশাতে, অজানাকে জানার নেশাতে আমিও বছরের পর বছর অরণ্যে পর্বতে প্রবাসে দিন কাটাচ্ছি। এই পরিশ্রমের বদলে কি কিছু পাই নি? পেয়েছি, অনেক পেয়েছি। পাখির পেছন পেছন ঘুরে মোটেই ঠকি নি, একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। জানি না, আর কতদিন এমনি ঘুরতে পারব। বয়স বাড়ছে।"—ডক্টর থামলেন।

আমি আর বিল নিশ্চুপ। আমাদের ধ্যান ভাঙল সার্কিট হাউসের খানসামার ডাকে।—"সাব্, খানা তৈরি।"

ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি রাত প্রায় ৯টা। বাইরে গাঢ় অন্ধকার। ডক্টর বললেন—"চলুন খেতে যাই।"

অবাঙালীদের কথা বাদই থাক, শান্তিনিকেতনে বরাবর বিদেশী ছাত্রছাত্রীর ভিড়। সেই ১৯২১ সাল থেকে। কেউ আসে নাচগান শিখতে, কেউ ছবি আঁকতে। কেউ কেউ আসে আবার নানা বিষয়ে পড়াশোনা করতে। কোর্সও হরেক রকম। একমাস থেকে চার বছর পাঁচ বছর।

আর শান্তিনিকেতনের গেরুয়া মাটির এমনই টান, দুদিনেই সাহেব-মেমদের ভোল পাল্টে যায়। খালি পা'তো বটেই, ছেলেরা পরে পাজামা পাঞ্জাবি, মেয়েরা শাড়ি ব্লাউজ নয়তো সালোয়ার-কামিজ। খাওয়াও সেই কিচেনের ডাল-ভাত মাছের ঝোল।

বিদেশীদের দলে মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, রুশী, ইন্দোনেশিয়ান, আফ্রিকান, তুর্কী, মিশরী সব দেশের লোক আছে। তাদের অনেকে সিরিয়াস স্টুডেন্ট, লাইব্রেরিতে মাথা গুঁজে দিনরাত বই পড়ছে। কারও কারও কোর্স বেশ মজার। যেমন একজনের হয়ত রবীন্দ্রসাহিত্য, সেলাই, মণিপুরি নাচ, হিন্দি। অন্যজনের আবার বাংলা, তবলা, বাটিকের কাজ, রবীন্দ্র-সংগীত।

দীপচাঁদ বিহারী গুপ্ত নামে মরিসাসের একটি ছেলে পড়তে এল বছর আট আগে। সে এম, এ, পরীক্ষা দেবে ইংরেজিতে। সেই পরীক্ষায় তার থিসিসের বিষয় 'বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য।' সে বাংলা জানে না, হিন্দি কিছু জানে। তাই এই সাহিত্য পড়ল হিন্দি অনুবাদে। থিসিস লিখল ইংরেজিতে। এবং দু'বছর কাটিয়ে দেশে ফিরল হিন্দিতে বাংলা সাহিত্য পড়ে ইংরেজিতে [illegible] বিশ্বভারতীর এম, এ, ডিগ্রি নিয়ে।

পাজামা শালোয়ারের মত বিদেশীরা এলেই রবীন্দ্রসংগীতের রসে জমে যায়। দুদিন যেতে-না-যেতেই দেখা যায়, অন্যান্যদের সঙ্গে ওরাও গলা মিলিয়ে গাইছে "হামদেড় শান্‌টিনিখেটান্‌—"

সকাল বেলা যখন ক্লাস চলছে, শোনা গেল, ছাতিমতলার ওদিক থেকে মার্কিন ছাত্র জন বেরির গলা—'টোমাড় হোলো শুড়ু, হামাড় হোলা সাড়া'। কিংবা বিকেলে পূর্বপল্লীর মাঠে বেড়াতে বেরিয়ে আপনমনে গান গাইছে তুর্কী গবেষক রাশী গোভেন—"যেটে দাও গেল যারা'—

এই ব্যাপারে তাদের সবাইকে কিন্তু টেক্কা মেরেছিল রুশী ছাত্রী আলমিরা—আমরা সবাই যাকে 'মীরা' বলেই ডাকতুম।

মীরা আজারবাইজানের মেয়ে। বয়স সতের কি আঠারো। ছ'বছর আগে বৃত্তি নিয়ে শান্তিনিকেতন এসেছিল রবীন্দ্রসংগীত শিখতে। বছর খানেক থেকে দেশে ফিরে গেছে।

মীরা পাঁচমিশেলি কোর্সে নাক গলায় নি, তার লক্ষ্য শ্রেফ রবীন্দ্রনাথের গান। বাকুতে থাকতেই সে কোন একজন বাঙালীর কাছে রবীন্দ্রসংগীতের দুচার কলি শুনেই মুগ্ধ হয়ে যায়, ঠিক করে, ওই গান শিখতেই হবে। মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাই সোজা চলে এল শান্তিনিকেতন।

এবং শুনলে অবাক হবার কথা, মীরা অল্প ক'দিনে এমন চমৎকার গান শিখল, বোঝার উপায় নেই সে রুশী, সে বিদেশী। পাকা একজন বাঙালী গাইয়ের মত চমৎকার গলায়, চমৎকার উচ্চারণে সে রবীন্দ্রসংগীত ধাতস্থ করল। শুধু তাই নয়, বার্ষিক সমাবর্তনে শান্তি-নিকেতনে এসে মীরার গান শুনে স্বয়ং জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত তাজ্জব।

মীরার সঙ্গে আমার আলাপ ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে, দোল-পূর্ণিমায়। এবং সেদিনের স্মৃতি চিরকালের জন্যে আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে।

দীর্ঘ বারো বছর কাটিয়ে আমি সেই সময়েই শান্তিনিকেতন ছেড়েছি। যোগ দিয়েছি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়। 'বসন্তোৎসব' দেখতে গিয়েছি। সারাদিনের হৈ-হুল্লোড়ের পর রাত্রে বৈতালিক। শালবীথির ফাঁকে ফাঁকে বাসন্তী জ্যোৎস্নার প্লাবন। ফুলের গন্ধে মন উতলা। এবং তারই সামনে দিয়ে চলেছে গানের মিছিল।—"ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে ধরা দিয়েছ।"—শালবীথি স্তব্ধ, বনপুলক স্তব্ধ, আম্রকুঞ্জের ডালে ডাকা কোকিল স্তব্ধ।

রাত দশটায় শ্রীঅনিলকুমার চন্দের বাড়িতে গিয়ে বসেছি। শ্রীমতী রানী চন্দও আছেন। দিল্লি থেকে ওঁরাও এসেছেন ছুটিতে।

বাইরে খোলা মাঠের মাঝখানে চন্দনে-মাখা আকাশের তলায় আমরা কজন বসে আছি, এমন সময় হাজির কলকাতার ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসেস অফ ইণ্ডিয়ার বড়-কর্তা ডক্টর শার্ত্র্া সস্ত্রীক। এই মার্কিন দম্পতি রাতের ওই বৈতালিক শুনে মুগ্ধ। এসেই বললেন, "আরও গান শুনব—টেগোর সঙ্।"

অনিলদা বললেন, "কেন, সকালবেলার অনুষ্ঠানে এত গান শুনেও কি মন ভরল না?"

"সত্যিই তাই—" মিঃ শার্ত্র্া বললেন—"একদম ভরে নি। এমন আশ্চর্য সুন্দর গান।"

এদিকে আমরা যারা এই আসরে উপস্থিত, সবাই অ-সুর, সাত চড়েও গলায় সুর বেরোয় না। তাহলে কাকে ডাকা যায়? একজন বললে আলামিরাকে আনা যাক।

সবাই সমর্থন জানাল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল গাড়ি, এবং মিনিট দশেকের মধ্যে আজারবাইজানের জাতীয় পোশাক পরা আলমিরা সশরীরে উপস্থিত।

বেশী বলতে হল না, মীরা তৎক্ষণাৎ গান ধরল—"দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি—"

আহা, গলা তো নয়, মধু মধু।—সুর হয়ে ঝরে পড়ছে। যেমন চড়ায়, তেমনি খাদে; এই বিদেশী তরুণীর কণ্ঠের আশ্চর্য আরোহণ, অবরোহণ।—"আসিবে ফাল্গুন, তখন আবার শুন—।" আমরা তন্ময় হয়ে শুনছি।

গান শেষ হতেই মিসেস শাত্র্যার-র উল্লাসধ্বনি—"এক্সকুাইজিট!" আমরাও চেঁচালুম—"আর একটা, আর একটা।"

পরিষ্কার বাংলায় মীরা বললে—"কোনটা গাইব?"

রানীদি বললেন—"যেটা খুশী!"

মীরা বললে—"আচ্ছা, তাহলে 'সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়' গাইছি।"

মীরা গান ধরতে যাবে, এমন সময় অনিলদা অতিথি মার্কিন-দম্পতিকে বললেন—"জানেন এই গান গুরুদেব ইন্দোনেশিয়ায় বসে লিখেছেন। তিনি তখন ওই দেশে গেছেন বেড়াতে। তাঁর জাহাজের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল একটি ছোট নৌকো। তাই দেখে গুরুদেবের মনে পড়ে গেল দেশের কথা, শরৎকালের বাংলার কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেললেন ওই গান!—"

অনিলদা থামতেই মীরা গান ধরল। তার গলায়, ও-গানেও, সাপ খেলাবার বাঁশি। মীরা গাইছে—

"তাই শুনে আজি বিজন প্রবাসে হৃদয়মাঝে
শরৎ-শিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে।
ছবি মনে আনে আলোতে ও গীতে—যেন জনহীন নদীপথটিতে,
কে চলেছে জলে কলস ভরিতে অলস পায়ে,
বনের ছায়ে।"

মিস্টার শাত্র্যা আর নিজেকে আটকাতে পারলেন না। চেয়ার ছেড়ে উঠে মীরার হাত জড়িয়ে ধরলেন, বললেন—"শাবাস! এমন আনন্দময় মুহূর্ত জীবনে আর পাই নি।"

মিসেস শাত্র্া বললেন—"আমিও।"

আমি বললুম—"আমার কাছেও এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত সোভিয়েট রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আজ এক সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে।"

"আর জায়গাটাও দেখতে হবে"—

অনিলদা ফোড়ন কাটেন—"শান্তিনিকেতন। পুব-পশ্চিম, বাম-ডান সবাই মিলতে পারে এই একটিমাত্র জায়গাতেই।"

রাত তখন প্রায় দশটা! চাঁদের হাসি তখনও বাঁধভাঙ্গা। মীরা আর একটা গান ধরল।

শান্তিনিকেতনে যতদিন ছিলুম, আচার্য নন্দলাল বসুর সঙ্গে আমার দেখা হত প্রায়ই। কথা হয়েছে কদাচিৎ। তিনি তখন কলাভবনের অধ্যক্ষ, আমি শিক্ষাভবনের ছাত্র। ছাত্রজীবন পেরিয়ে যখন মাস্টারী শুরু করেছি, তখন তিনি অবসর নিয়েছেন। কলাভবনে আসেন খুব কম।

অনেক দিন থেকেই ইচ্ছে ছিল আচার্য নন্দলালের সঙ্গে ছবি নিয়ে আলাপ করি। সাহস হয় নি। তা ছাড়া ইচ্ছেটা যখন দানা বাঁধল, তিনি ততদিনে অসুস্থ। বাড়ির ভেতরেই থাকেন বেশীর ভাগ।

বহুদিনের সেই ইচ্ছে পূর্ণ হয় ১৯৫৬ সালে। আমি সেই বছরই শান্তিনিকেতন ছেড়ে 'আনন্দবাজারে' যোগ দিয়েছি।

পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস থেকে সেবার নন্দলালকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। দলবল চলে যায় শান্তিনিকেতন। আমিও সঙ্গী হই সাংবাদিক হিসেবে। এবং সেদিন অনুষ্ঠানের পর ঢুকে পড়ি তাঁর বাড়িতে।

শ্রীনিকেতন যাবার পথে নন্দলালের বাড়ি। তাঁর ছেলে বিশুদা অর্থাৎ বিশ্বরূপ বসুর সঙ্গে আগেই কথা হয়েছিল। আমি নন্দলালকে প্রণাম করলুম বাড়ির পেছনের চত্বরটায়।

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি বসে আছেন। গায়ে সাদা ফতুয়ার উপর চাদর জড়ানো। চোখে মুখে অসুস্থতার ছাপ। কথা বলতে কষ্ট হয়।

অথচ কিছুদিন আগেও তাঁকে দেখা যেত শান্তিনিকেতনের পথে।

কখনও যেতেন কলাভবনে 'নন্দনের' বারান্দায়—ছাত্র-ছাত্রীরা এসে ছবি শুধরে নিত, ছবি সম্পর্কে দু'চার কথা হত। কখনও বা হাঁটতে হাঁটতে যেতেন বড় মেয়ে গৌরী দেবীর বাড়ি। গায়ে সেই সাদা ফতুয়া। পরনে সাদা লুঙ্গি। আরবীদের মত মাথায় ফেটি করে বাঁধা তোয়ালে। এবং গান্ধীজীর 'দাণ্ডী মার্চের' ভঙ্গিতে লাঠিহাতে ঈষৎ কুব্জদেহ টেনে নিয়ে তিনি চলতেন।

চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে কুশলবার্তা জিগ্যেস করতেন। হাঁটতে হাঁটতে ঘাসের ওপর রঙীন ফুল দেখলে দাঁড়িয়ে পড়তেন। কখনও বা তাকিয়ে থাকতেন লাল বাঁধের ওপারে তালগাছ ঘেরা দূর খোয়াইয়ের অস্তিমে। আজকাল আর তা হবার উপায় নেই। বার্ধক্যের বোঝা নিয়ে শিল্পী আজ বন্দী।

যাই হোক, একথা-সেকথার পর মডার্ন আর্টিস্টদের সম্পর্কে জানতে চাইলুম তাঁর মত। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে ধীরে ধীরে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন—

"দেখ, আজকাল সবাই ভাবছে, ছবিতে নতুন কিছু করি। ওটা একটা ফ্যাশনের মত। আমাদের দেশের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায় না, তবু বিদেশী জিনিস আমদানী করা চাই। কিন্তু জোর করে তো পরিবেশ তৈরি করা যায় না। বিদেশী ছবি ওদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়েছে, তাই ছবিও ভাল হয়েছে। বিদেশী জিনিস নিতেই পারবে না, এমন কথা বলিনে। তবে ওদেরটা 'এসিমিলেট' করতে হবে। তা ছাড়া আমাদের পুরনো ধারাতেই এগিয়ে যাওয়া চাই। এই ধারা অবনীবাবু ও আমি নিয়েছি। পুরাতন থেকে অনেক কিছু আমরা পেয়েছিও। শুধু কি ইণ্ডিয়ান? চাইনিজ, জাপানীজ থেকেও নিয়েছি। কেন না ওদের ধারার সঙ্গে আমাদের মিল রয়েছে যে।"

আমার পরবর্তী প্রশ্ন আজকালকার ছবির বর্ণবাহুল্য সম্পর্কে। জবাবে তিনি বললেন—"রঙ বেশী দিলেই ছবি খারাপ হয় না,

তবে ঠিকমত রঙ লাগাবার ক্ষমতা থাকা চাই। রাজপুত ছবিতেও বর্ণবাহুল্য আছে। কিন্তু বর্ণবাহুল্য করবে বলে জোর করে রঙ চাপালে জৌলুস বাড়ে, ছবি হয় না।"

কথা বলতে বলতে তিনি চলে যান এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনে কলাভবনের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে বলেন—"এখানে আমরা নজর দিই প্রথম তিনটি জিনিসের ওপর—অরিজিন্যালিটি, নেচার স্টাডি এবং ট্র্যাডিশন। প্রথমে 'নেচার' থেকে ছবি নেবে, কিন্তু সেটা অরিজিন্যাল হওয়া চাই। তারপর আসে ঐতিহ্যের কথা 'ট্র্যাডিশনাল' হলেই 'স্টিরিওটাইপড্' হয় না। তার প্রমাণ অবনীবাবুর ছবি, রবীন্দ্রনাথের ছবি। অবনীবাবু অনেক পুরনো সাবজেক্ট নিয়ে ছবি এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ মহাভারত থেকে কত কাহিনী নিয়েছেন। সেও তো নতুন সৃষ্টি হয়েছে। আসল কথা, অরিজিন্যালিটি থাকলে 'সাবজেক্ট' একঘেয়ে হয় না। আমি বীরভূমের দৃশ্যাবলীর একই ছবি এঁকেছি অনেক, তবু সে একঘেয়ে হয় নি ইমাজিনেশনের জন্যে। ধর 'বসন্ত ঋতু।' এই ঋতু নিয়ে কালিদাস থেকে শুরু করে কত কবিই না কবিতা লিখেছেন। সে কি একঘেয়ে হয়েছে? হয় নি। কারণ প্রত্যেক কবিরই অরিজিন্যালিটি ছিল। ছবিও একঘেয়ে হয় না—অরিজিন্যালিটি থাকলে, ইমাজিনেশন থাকলে। আজকালকার অনেক মডার্ন আর্টিস্ট নতুনের মোহে নভেলটি দেখাচ্ছেন, কিন্তু অরিজিন্যালিটি দেখাতে পাচ্ছেন কই?

"আমার ধারণা কী জান? মডার্ন আর্টিস্টরা 'নেচার'কে বড় ভয় পান। কিন্তু 'নেচার' বাদ দিয়ে ছবি কী করে হবে? আজকালকার আর্টিস্টরা যদি চিরটাকাল কলকাতাতেই কাটান, তবে ভাল ছবি হবে না। কেবল বড় বড়, চৌকোচৌকো, লম্বা লম্বা বাড়ি দেখে 'কিউবিজম' করতে হবে। তবে হ্যাঁ, তাঁরা যদি গুরুদেবের গানও একটু মন দিয়ে শোনেন তবে কাজ হয়। গুরুদেব গানে

'নেচার'কে বেঁধে রেখেছেন। ওঁর গান শুনলে 'নেচার'কে বোঝা যায়।"

এবারে কথা তুললুম সোভিয়েট আর্টিস্টদের সম্পর্কে। একটু হেসে তিনি বললেন—"ওরা প্রোপাগাণ্ডিস্ট। আর্ট আর প্রোপাগাণ্ডা এক জিনিস নয়। ওরা তো কেবল লীডারদের ছবি এঁকে এঁকেই গেল। ওদের আগেকার আর্ট তবু ভাল। তার সঙ্গে যোগ আছে রেনেসাঁর।"

ছবিতে এক্সপেরিমেণ্টের কথা তুলতেই তিনি জানালেন—

—"হ্যাঁ, এক্সপেরিমেণ্ট ভাল, তবে আমি কিছুই জানিনে, অথচ এক্সপেরিমেণ্ট করছি, সেটা হয় না। মাতিস, এপস্টাইন বড় আর্টিস্ট, ড্রয়িং-ভাল জানতেন। তাঁরা অনেক এক্সপেরিমেণ্ট করে সফল হয়েছেন।"

কথায় কথা বাড়ে। শিল্পী ততক্ষণে শ্রান্ত। প্রণাম করে বেরোব ভাবছি, তখন বললেন—"তবে দেশের শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ভেবো না। এই যে এতগুলো ধারা প্রবহমান, তার সঙ্গে চলে চলে নতুন ধারা আসবে। অবনীবাবু সেই ধারায় করলেন, আমিও করলুম। তারপর অন্য কেউ করবে, ধারা অব্যাহত থাকবে।"

বাইরে বেরিয়ে দেখি, সামনে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। আর বর্ষার অজস্র ধারা।

দূর থেকে ভেসে আসছে গানের সুর। নন্দলালের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে সঙ্গীতভবন মঞ্চে এখানকার ছাত্রছাত্রীদের 'নটীর পূজা' অভিনয় তখনও শেষ হয় নি।

পরশুরাম

রাজশেখর বসুর সঙ্গে আমার একবার মনোমালিন্য হয়েছিল। বছর চৌদ্দ আগে একটি ঘটনায় তিনি ভীষণ চটেছিলেন। তারপর অবশ্য অনুতপ্ত হয়ে লিখেছিলেন, আমি যেন আর ক্ষোভ পুষে না রাখি। সেই কাহিনীটাই আজ বলি।

১৯৪৭ সালে আমরা কয়েকজন শান্তিনিকেতনে 'ভুশণ্ডীর মাঠে' অভিনয় করি। অভিনয়টা ছিল অভিনব। বন্ধুদের ফরমাশে এক রাত্তিরে বসেই পরশুরামের লেখা গল্পটির গীতিনাট্যরূপ দিই।

আমি তখন শিক্ষাভবনে ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। শুভময় ঘোষ আর বিশ্বজিৎ রায় একদিন এসে বললে, "'আনন্দমেলার' জন্যে তোকে একটা নাটক লিখতে হবে কালকের মধ্যে। 'আনন্দমেলার' আর তিন দিন বাকি, ওই দিন আমরা নাটক মঞ্চস্থ করব।"

আমি তৎক্ষণাৎ রাজী এবং রাত জেগে জেগে একটা মজার নাটক তৈরি করলুম। কারিয়া পিরেত, যক্ষ, ব্রহ্মদৈত্য, শাকচুন্নি, পেত্নীর মুখে জুড়ে দিলুম অজস্র হাসির গান, এবং দেড়ঘণ্টার উপযোগী একটা নাট্যরূপ দিলুম ওই গল্পের।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল রিহার্সেল। অধিকাংশ গানের চমৎকার সুর দিলেন কবি লোকনাথ ভট্টাচার্য এবং অরবিন্দ বিশ্বাস। একটা গানের সুর লাগালেন শান্তিদেব ঘোষ স্বয়ং। আর অভিনয় যেদিন হবে, মঞ্চ সাজানোর ভার নিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এলেন রামকিঙ্কর এবং বিনায়ক মাসোজি। শৈলজারঞ্জন মজুমদারও কোরাস গান ঠিক করে দিতে নিজেই এলেন। বনবাদাড় উজাড় করে আর আলোর কেরদানি দেখিয়ে সিংহসদনের মঞ্চ হল তদধিক চমৎকার।

অভিনয় দেখে শান্তিনিকেতনের সবাই 'থ'। কালি ঝুলি মাখা ভূতপ্রেতের দল আমাদের নিয়ে দারুণ হৈ চৈ। কর্তা ব্যক্তিরা অনুরোধ করলেন, পরদিন আবার অভিনয় করতে। বললেন,—এমন গান, এমন অভিনয় শান্তিনিকেতনের জীবনে ইদানীং হয় নি।

পরদিনের অভিনয় হল আরও চমকদার এবং রাতারাতি সকলের কাছে আমাদের খাতির বেড়ে গেল দারুণ। আশ্রমের পথেঘাটে শুধু 'ভুশণ্ডীর মাঠে'র গান। সকাল বেলা ক্লাস চলছে, হঠাৎ শালবীথির ওই পারে শোনা যায় পেত্নীর গান—'আয়রে চিংড়ি মাছ আয়রে,' কিংবা আম্রকুঞ্জের তলায় ব্রহ্মদৈত্যরূপী শিবু ভটচাজের গান—'চমকি চলিতে থমকি দাঁড়ালে, কে তুমি ডাকিনী চলেছ আড়ালে।' বিকেলে খেলার মাঠে, এক্সকার্সনে, পিকনিকে হরদম ফরমাশ চলে 'ভুশণ্ডীর মাঠে'র গান। তাছাড়া আমরা অভিনেতার দল একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতুম বলে শ্রীঅনিলকুমার চন্দ তো আমাদের দিয়ে যেখানে-সেখানে যখন-তখন নাটকটাই পুরো অভিনয় করিয়ে নিতেন।

নাটকটির শুরু ছিল প্রাচীন যাত্রাগানের কায়দায়। প্রস্তাবনায় ছিল তুড়ি এবং জুড়ির ভূমিকা। তুড়ি সেজেছিল কবি লোকনাথ ভট্টাচার্য এবং জুড়ি বিশ্বজিৎ রায়। কবি লোকনাথ ভট্টাচার্য ফরাসী দেশের ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে এখন আছেন দিল্লিতে—'স্প্যান'-এর সাহিত্য সম্পাদক। বিশ্বজিৎ আছে রুশদেশে—কাজ করছে মস্কো রেডিওতে।

ব্রহ্মদৈত্যরূপী শুভময় ঘোষ এখন পরলোকগত। সে মস্কোতে অনেকদিন কাজ করেছে। সড়াক করে তালগাছ থেকে নেমে পড়া কারিয়া পিরেত সেজেছিলুম আমি নিজে এবং যক্ষবেশী যাদু মল্লিক সেজেছিল অরুণ বাগচি। ছ বছর লণ্ডনে কাটিয়ে এখন সে কলকাতায়, হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ডে।

পেত্নীর ভূমিকা নেয় প্রবীর গুহঠাকুরতা, ডাইনি শ্যামল মুখোপাধ্যায় (একবার সুদেব গুহ) এবং শাঁকচুন্নি হীরেন্দ্র চক্রবর্তী

(একবার প্রণব গুহঠাকুরতা) তাছাড়া বিভাস সেন ছিলেন অন্তরালের সকল ভার একসঙ্গে নিয়ে। "পাত্রপাত্রী" সকলেই তখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র।

'ভুশণ্ডীর মাঠে'র নামডাক পৌঁছল কলকাতা। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের মারফৎ রাজশেখর বসুও শুনলেন সফল অভিনয়ের কথাটা। তিনি দেখার বাসনা প্রকাশ করলেন।

শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষ এবং আমরা উদ্যোক্তারা রাজশেখরবাবুর ইচ্ছে শুনেই রাজী। ১৯৪৮ সালের ১৪ই এপ্রিল অর্থাৎ বাংলা নববর্ষ উৎসবে রাজশেখরবাবুকে নিমন্ত্রণ জানানো হল এবং সেদিন রাতেই ব্যবস্থা হল 'ভুশণ্ডীর মাঠে' অভিনয়ের লাইব্রেরির বারান্দায়, এলাহি ব্যবস্থায়।

অভিনয়ের পর রাজশেখরবাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, "আমার মেয়ে এবং জামাইয়ের মৃত্যুর পর, অর্থাৎ প্রায় বিশ বছর পরে এই প্রথম একটি আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিলাম এবং আপনাদের অভিনয় দেখে বড় আনন্দ পেলাম। আমি ভাবতেই পারি নি আমার গল্পের ভূত প্রেত এমন মজাদার মজাদার গান গেয়ে আসর মাৎ করবে। কাল সকালে একবার আসবেন 'উত্তরায়ণে'।"

রাজশেখরবাবু উত্তরায়ণের 'উদয়ন' বাড়িতে সেবার উঠেছিলেন। আমরা দল বেঁধে দেখা করতে গেলুম। যেতেই বললেন, "আপনাদের সকলের অটোগ্রাফ চাই।"

বলেন কী? আমরা তো ভেবেছিলুম তাঁর সঙ্গে ছবি তুলে আমরাই অটোগ্রাফ নেব। তিনি বললেন,—"আমার চেয়ে আপনাদেরই জিত বেশী। তাই অটোগ্রাফ আমারই দরকার।"

আমি নাট্যরূপের একটা পাণ্ডুলিপি তাঁকে উপহার দিই তখন। তিনি সেটাতেই আমাদের সকলের অটোগ্রাফ নিলেন এবং 'উত্তরায়ণে'র বারান্দায় একটা গ্রুপ ফটোর মাঝখানে মধ্যমণি হয়ে ক্যামেরায় ধরা দিলেন।

রাজশেখরবাবু কলকাতায় ফিরে আরও দশ জনকে জানালেন এই অভিনয়ের কথা। কয়েকজন শান্তিনিকেতনে ছুটে এসে কলকাতায় অভিনয়ের জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। আমরা সবাই তখন ছাত্র, এই অনুরোধে আমরা তো লাফিয়ে উঠলুম।

১৯৪৮ সালের ২৫শে জুলাই মনোজ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে 'শ্রীরঙ্গমে' আবার অভিনীত হল 'ভুশণ্ডীর মাঠে।'

রাজশেখর বাবু অসুস্থ থাকায় ইচ্ছে সত্ত্বেও সেদিনকার অভিনয়ে আসতে পারলেন না।

কলকাতার লোকেরা একদিনের অভিনয়ে তৃপ্ত হলেন না। তাঁদের দাবি, আবার করতে হবে। আমাদের ততক্ষণে উৎসাহ ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে-ই করতে হল। তারিখ ধার্য হল ১৯৪৯ সালের ১১ই জুলাই, স্থান 'নিউ এম্পায়ার', উদ্যোক্তা বিশ্বজিতের ছোট মামা সমীর দত্ত।

এতকাল অভিনয় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে হয় নি। এই প্রথম সেই ভাবেই প্রযোজক এগোলেন। কে একজন তখন বললেন, তাহলে কিন্তু মূল লেখক রাজশেখরবাবুর অনুমতি নেওয়া দরকার। এদিকে অবশ্য পোস্টার পড়ে গেছে, কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপনও চলছে।

আমি আর বিশ্বজিৎ ৭২, বকুলবাগান রোডে রাজশেখরবাবুর বাড়িতে অনুমতি নিতে গেলুম। ফরাসপাতা নির্জন বৈঠকখানা ঘরে আমরা দুজন বসে আছি, তিনি চটি পায়ে দোতলা থেকে নামলেন। আমরা প্রণাম করতে এগোলুম। রাজশেখরবাবু ঠাণ্ডা গলায় বললেন—"না, দরকার নেই, আমি কারও প্রণাম নিই না।"

বিশ্বজিৎ আমতা আমতা করে নিবেদন করলে—"কাল অভিনয় নিউ এম্পায়ারে, আপনার অনুমতিটা—"

রাজশেখরবাবু কিঞ্চিৎ উষ্মার সঙ্গে জবাব দিলেন—"বিজ্ঞাপন তো দিয়েই দিয়েছেন, আমার অনুমতির আর কী দরকার। আচ্ছা নমস্কার।"

বলেই তিনি দোতলায় উঠে গেলেন। আমরাও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সদর রাস্তা ধরলুম।

কিন্তু এখন উপায়? অভিনয় তো বন্ধ রাখা যায় না, অথচ রাজশেখরবাবু যদি ফের আপত্তি তোলেন? এবং শুনতে পেলুম তিনি আমার উপর ভীষণ ক্ষেপে আছেন।

বিশ্বজিৎ আর আমি দুজনেই মুসাবিদা করে তখনই বাড়ি ফিরে এক চিঠি পাঠালুম, আগে না জানানোর জন্যে ক্ষমা চেয়ে। এবং ঠিক করে ফেললুম অভিনয় করবই, যা থাকে বরাতে।

পরদিন রাজশেখরবাবুর জবাব পেলুম। চিঠিটা হুবহু এইরূপ:—

৭২, বকুল বাগান রোড,
কলিকাতা
১৮।১০।৪৯

সবিনয় নিবেদন—

আপনার পত্র কাল সন্ধ্যায় পেয়েছি আপনারা আমার অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই অভিনয়ের বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এবং অভিনয় করেছেন। অতএব এখন অনুমতি নিরর্থক।

বিনীত—
রাজশেখর বসু।

তুলোট কাগজে হরিতকির কালিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। এক একটি অক্ষর আমার কাছে যেন বজ্রশেল।

ক্ষমা চাইবার জন্যে আবার তাঁর বাড়িতে গেলুম। তিনি দেখাই করলেন না। আমি তখন অনুশোচনায় মরছি। এতবড় একজন মনীষীর সঙ্গে এত মধুর সম্পর্ক পাতিয়ে শেষে কিনা সব ভরাডুবি হল। এদিকে পূজনীয় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের মারফৎ শুনতে পেলুম, রাজশেখরবাবুর রাগ পড়ে নি।

একদিন বেড়াতে গিয়েছি আর্ট প্রেসের একদা-মালিক নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। তিনি রাজশেখরবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং এই মুখোপাধ্যায় পরিবারে গিয়ে রাজশেখরবাবুর নিজের হাতে তৈরি-করা নেবু, আম ইত্যাদির আচার প্রায়ই খেতুম। রাজশেখরবাবুর শখ ছিল আচার তৈরিতে এবং নরেনবাবুকে প্রতি হপ্তায় এক এক শিশি উপহার দিতেন।

নরেন বাবুর ছেলে অরুণদা আমাকে বললেন—"রাজশেখরবাবু তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করায় এখন বড় অনুতপ্ত। তুমি তাঁকে একটা চিঠি দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নাও এবং দেখা কর একদিন।"

আমি একশবার ক্ষমা চাইতে রাজী। বাড়ি ফিরেই আর একখানা চিঠি ছাড়লুম, এবং পরদিনই জবাব হাজির।

৭২, বকুলবাগান রোড,
কলিকাতা
১৫।১১।৪৯

সুহৃদবরেষু

আপনার পোস্টকার্ড যথাকালে পেয়েছি। আমার বিজয়ার নমস্কার ও শুভেচ্ছা জানবেন। অভিনয় সম্বন্ধে আপনি আর কোনও ক্ষোভ মনে রাখবেন না, আমারও কোন ক্ষোভ নেই।

শুভাকাঙ্ক্ষী
রাজশেখর বসু

আমি চিঠি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। আগের চিঠির সঙ্গে এ চিঠির ভাষায় ও বক্তব্যে কত তফাৎ! দু'একদিনের মধ্যেই তাঁর বাড়িতে আবার গেলুম। তিনি আমার সঙ্গে হেসে কথা বললেন, জানালেন সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি যেন কেউ আর মনে না রাখি।

রাজশেখরবাবু আমায় বলেছিলেন মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে যেতে। আমি যেতুম এবং একদিন তিনি অনুরোধ করেন, তার লেখা আরও কয়েকটি গল্পের গীতিনাট্যরূপ দিতে।

নানা ঝামেলায় সে অনুরোধ আমি রাখতে পারি নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মধুর সম্পর্কের স্মৃতি চিরকাল আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

সিদ্ধান্ত বাগীশ

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের নাম মনে পড়ে। তাঁর অক্ষয় কীর্তি সটিক মহাভারতের ছাপা যেদিন সম্পূর্ণ হয়, ঠিক সেই দিনই আমি এই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবরের সঙ্গে দেখা করতে যাই। ১৯৫৯ সালের ১৬ই মে।

তিনি আজ ইহলোকে নেই, অজস্র সম্মান কুড়িয়ে ৮৫ বছর বয়সে কিছুদিন হল বিদায় নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎকারের সেই দিনটি স্মরণ করি।

এণ্টালি দেব লেনের বাড়িতে ঢুকে দেখি পৃথিবীর প্রথম কবিতা অকস্মাৎ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আদিকবি বাল্মীকি যে আনন্দের আবেশে অভিভূত হয়েছিলেন, বোধ হয় সেই রকম আনন্দেই আচ্ছন্ন হয়ে আছেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়। তবে এ আনন্দ আকস্মিকের বিস্ময়ের নয়, দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের একক পরিশ্রম ও নিরলস নিষ্ঠার সমাপ্তিতে তৃপ্তির ও স্বস্তির আনন্দ। তাঁর সযত্ন-পোষিত স্বপ্ন এতদিনে সফল হয়েছে, তাঁরই সম্পাদিত অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের শেষ খণ্ডের ছাপা এতদিনে শেষ হয়েছে। নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে অগাধ পাণ্ডিত্য ও দুর্জয় সাহস মাত্র সম্বল করে জীবনের মধ্যভাগে যে দুঃসাহসিক কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন, আজ তিরাশী বৎসর বয়সে জীবনের শেষভাগে এসে সেই কাজের সমাপ্তি দেখে তাঁর মনে সত্যিই আনন্দের অবধি নেই।

ম্লান গোধূলির আলোয় ত্রিতলের এক নিভৃত কক্ষে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমিও যেন চলে গিয়েছিলাম কোন এক প্রাচীন ঋষির তপোবনে। অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গে শ্বেত উপবীত,

কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, চোখে তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি—শুধু দুরূহ তত্ত্বের অভ্যন্তরে নয়, হৃদয়ের অন্তস্তলও ভেদ করে যায়।

সে এক কঠিন সংগ্রামের ইতিহাস। নবভারতের "নৈমিষারণ্য" ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া গ্রামে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতবংশে যে ব্রাহ্মণ বালকের জন্ম, সেই বালকই উত্তরকালে পণ্ডিতবংশের যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েছেন। 'অমৃত সমান' মহাভারত কাহিনীর অত্যাশ্চর্য সম্পাদনা সমাপ্ত করে এক দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়েছেন।

লক্ষ লক্ষ অর্থ ব্যয়ে এবং একাধিক পণ্ডিতের পরিশ্রমে যে কাজ সম্পূর্ণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, ঠিক সেই কাজেই হাত দিয়েছিলেন সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়। লোকবল, অর্থবল কিছুই নেই, আছে শুধু দুর্জয় সাহস আর সাধকের নিষ্ঠা। সেই সাহস ও নিষ্ঠার পুরস্কার হিসেবে তিনি নিজের চক্ষে দেখে যেতে পারলেন মহাভারতের স্বকৃত টীকা, প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, নীলকণ্ঠকৃত প্রাচীন টীকা ও পাঠান্তর সহ প্রায় ৫০ হাজার পৃষ্ঠায় ১৫৯ খণ্ডে লেখা মহাভারতের নবতম সংস্করণ।

তিনি তখন শেষ খণ্ডের শেষ ফর্মায় আর একবার চোখ বোলাচ্ছিলেন। সম্মুখে মহাভারতের মুদ্রিত অন্য একটি খণ্ড। শেষ ফর্মায় চোখ বুলোতে বুলোতে তাঁর মন বোধ হয় চলে গিয়েছিল বহু বৎসর আগেকার একটি শুভদিনে—যে দিনটিতে তিনি মহাভারত সম্পাদনার দুঃসাহসিক কাজে হাত দিয়েছিলেন।

"জিজ্ঞাসা করিতেছেন কবে কাজ আরম্ভ করি। সেই দিনটি আমার পরিষ্কার স্মরণে আছে। ১৮৫১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ৩রা শ্রাবণ, শুক্রবার বেলা ৭ ঘটিকায়। চন্দ্রেষু নাগেন্দুমিতে শকাব্দে শুক্রে তৃতীয়েহহনি কর্কটার্কে, ময়া মহাভারতমত্র লিপ্তুমারব্ধ-মাসীৎ স্মরতা মহেশম্।"

সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের মুখে সংস্কৃত স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বেরিয়ে

আসছিল। সংস্কৃতে আমার অনভিজ্ঞতা জেনে সঙ্গে সঙ্গেই সাধু বাংলাতে আবার বলতে শুরু করেন।

"অর্থবল নাই, লোকবল নাই, শুধু আছে বিদ্বজ্জনের উৎসাহ। কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয় ও স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী নানাভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণও উৎসাহ দিলেন। কাজ আরম্ভ করিলাম। তখন বাস করি সুরী লেনের বাড়িতে।

"বলিতে ভুলিয়াছি, আনন্দবাজার পত্রিকাও প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারা বিনামূল্যে বহু বৎসর এই মহাভারতের বিজ্ঞাপন ছাপিয়াছিলেন।"

"আপনি কখন বসে লিখতেন"—আমার কৌতূহলমিশ্রিত জিজ্ঞাসা।

"প্রাতঃকালে স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া সকাল সাত ঘটিকা হইতে সাড়ে দশ ঘটিকা পর্যন্ত লিখিতাম। অপরাহ্নে আবার তিন ঘটিকা হইতে পাঁচ ঘটিকা। রাত্রিকালে কোন দিনই লিখি নাই। এই কাজ সম্পাদন করিতে আমাকে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। সংসারের দিকে, ব্রাহ্মণীর, পুত্র-কন্যার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি নাই। তদুপরি দারিদ্র্যও নিত্যসঙ্গী ছিল।"

"সরকার থেকে কোন সাহায্য পান নি?"

"পাইয়াছি। তবে অকিঞ্চিৎকর। মোট চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ সহস্র মুদ্রা হইবে। ১৫৯ খণ্ড মুদ্রণ করিতে আমার ব্যয় পড়িয়াছে প্রায় দেড় লক্ষ মুদ্রা। বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর আবেদনে জনসাধারণের নিকট হইতেও পাঁচ ছয় সহস্র মুদ্রা সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল।"

"আপনার কাজ শেষ হয় কবে?"

"আমি যখন কার্যারম্ভ করি, তখন আমার বয়ঃক্রম তিপ্পান্ন বৎসর। পক্ষব্দি, নাগেন্দুমিতে শকাব্দে শুক্রে বৃষাকে দিন ঊনবিংশে। অর্থাৎ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ১৯শে জ্যেষ্ঠ, শুক্রবার বৈকালে রচনা সমাপ্ত হয়।

তাহা হইলে হিসাব করিয়া দেখিতে পাইবেন, সময় লাগিয়াছে মোট ২০ বৎসর ১০ মাস ১৭ দিবস।"

"কিন্তু ছাপা শেষ হতে এত দেরি হল কেন।"

"পূর্বেই বলিয়াছি অর্থাভাব। তদুপরি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হেতু কলিকাতা শহরে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা। তজ্জন্য পূর্ণ পাঁচ বৎসর মুদ্রণকার্য বন্ধ ছিল। কিয়ৎকাল পর হিন্দু-মুসলমান সঙ্ঘর্ষে আরও দুই বৎসর কাজ স্থগিত থাকে।"

"মহাভারত সকল খণ্ডের দাম কত করেছেন?"

"তিনশত টাকা। কাজ আরম্ভের সময় কাগজের দিস্তা ছিল দুই আনা, এখন ক্রয় করিতেছি ৯২ নয়া পয়সায়। গ্রন্থ সম্পাদনের অব্যবহিত পর প্রায় ছয়শত জন আমার গ্রন্থের গ্রাহক হন। রবীন্দ্রনাথ একাই ছিলেন তিন গ্রন্থের গ্রাহক। গ্রাহকগণের অধিকাংশই জীবিত নাই। অনুমান করি, বর্তমানে ৩০।৫০ জন বাঁচিয়া আছেন।"

"আপনার এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যগুলি যদি দয়া করে বলেন।"

"প্রথমেই উল্লেখ করি, মহাভারত সম্পাদনা অতীব দুরূহ কার্য। অদ্যাবধি কেহই একা এই কার্যে অগ্রসর হন নাই। ইতঃপূর্বে বর্ধমান মহারাজার আনুকূল্যে চারি লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে তেরজন পণ্ডিত নিয়োগ করিয়া মহাভারতের কেবল মূল ও অনুবাদ করিতে ২৬ বৎসর সময় লাগে। কালীপ্রসন্ন সিংহ দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ছয়জন পণ্ডিতের সহায়তায় ১৭ বৎসরে শুধু মাত্র বঙ্গানুবাদ করান। পুণার ভাণ্ডারকর সমিতি মহাভারতের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন ১৯১২ সালে। সতের জন পণ্ডিতের সহযোগিতায় এখনও কাজ চলিতেছে। আমার গ্রন্থে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশীয় আটখানি মুদ্রিত ও হস্তলিখিত পুস্তক হইতে মূলের পাঠ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করা হইয়াছে। সঙ্গে সংযোগ করিয়াছি স্বকৃত টীকা, নীলকণ্ঠকৃত প্রাচীন টীকা, পাঠান্তর ও বঙ্গানুবাদ। প্রতি পর্বের প্রারম্ভে দিয়াছি মহর্ষি

লিখিত অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যার একটি তালিকা, উপরন্তু আদিপর্বের প্রথমে যুধিষ্ঠিরের সময় নামক অতিরিক্ত প্রবন্ধ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন ও দুর্যোধনের কোষ্ঠী ও দ্বাদশ রাশির ফলাফল এবং ব্যাসকূটসমূহের সরল বিশ্লেষণও রহিয়াছে।"

"রচনাকালে কোন্ কোন্ বইয়ের সাহায্য নিয়েছেন?"

একগাল হেসে তিনি বললেন, "অন্য কোন গ্রন্থের সাহায্য লই নাই, কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহায্যও পাই নাই। গত পাঁচ হাজার বৎসরের মধ্যে এই ধরনের সংস্করণ বোধ করি কেহই প্রকাশ করেন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত নীলকণ্ঠ এক লক্ষ শ্লোকের মধ্যে মাত্র ৯ হাজার শ্লোকের টীকা করিয়াছিলেন।"

বিস্ময়াভিভূতচিত্তে নবভারতের এই ঋষির কথা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছিলুম। জিগ্‌গেস করলুম—"আপনার আর কিছু লেখার ইচ্ছে আছে?"

নিকেলের চশমা নাকের ডগা থেকে খুলে ধুতির খুট দিয়ে কাচ মুছতে মুছতে বললেন, "আমার আর কাজ করার কোন ক্ষমতা নাই। বয়স হইয়াছে। তদুপুরি পাঁচ বৎসর পূর্বে বিসূচিকা রোগে দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তবে এখন আমার কোন আক্ষেপ নাই। আমার কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। এখন দৃষ্টিও ক্ষীণ হইয়াছে, পরিষ্কার দেখিতে পাই না।"

"আপনার আর কোনও শখ?"

"না, কিছুই নাই। পুস্তকের মুদ্রণ সমাপ্ত হইয়াছে, আমার সকল সাধ মিটিয়াছে। আর কিছুই আমার কাম্য নাই। স্মরণ হইতেছে আদিপর্বের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালের ১লা পৌষ তারিখে এবং ১৩৬৬ সালের ২৭শে বৈশাখ গ্রন্থ সমাপ্তির শেষ নিবেদন রচনা করি।"

বিদায় নেবার আগে একটু অন্যমনস্কভাবে বললেন, "আমরা গত ৩৫ পুরুষ যাবৎ সংস্কৃতের চর্চা করিয়া আসিতেছি। আমার

পরবর্তী পুরুষেও কিছু কিছু চর্চা রহিয়াছে। সম্ভবতঃ পরে আর থাকিবে না।"

বিদায় নেবার বহুক্ষণ পরেও পণ্ডিত মশায়ের শেষ কথা মনে পড়ছিল—'আমাদের বংশে সম্ভবতঃ আর সংস্কৃতের চর্চা থাকিবে না।' প্রাচীন ভারতের এই মহান উত্তরাধিকার সত্যই কি বিলুপ্তির পথে? মহামহোপাধ্যায়ের কণ্ঠে কি আক্ষেপের সুর ছিল?

কী খাবেন বলুন, চা না কফি ?"

"জাস্ট কফি, উইদাউট সুগার"—ভারী গলায় জবাব দিলেন পানিকর। সর্দার কেবলম মাধব পানিকর।

"তার সঙ্গে অন্য কিছু ?"

"না, না, শুধু কফি। আমরা দক্ষিণ ভারতের লোক। কফি ছাড়া আমাদের চলে না।"

"তা ঠিক। কিন্তু বাংলাদেশের মিষ্টি—রসগোল্লা, পান্তুয়া অন্তত খেয়ে দেখুন। নইলে দক্ষিণ ভারতের প্রতি পার্শিয়েলিটি দেখানো হবে যে"—বেতের মোড়াটা টেনে বসতে বসতে বলি আমি।

"এত মিষ্টি খেলে মারা পড়ব। কফিই খাচ্ছি চিনি ছাড়া"—হেসে জবাব দিলেন পানিকর। ছ'কাপ কফির অর্ডার দিয়ে শান্তিনিকেতনে পৌষমেলার চায়ের দোকানে গল্প জমিয়েছি আমি, শুভময় ঘোষ, ত্রিবাঙ্কুরের জন ম্যানন—এখানকার ইকনমিক্সের রিসার্চ স্কলার, শিল্পী মনীষী দে আর সর্দার পানিকর। সঙ্গে আছেন তাঁর সেক্রেটারী। পানিকর শান্তিনিকেতনে এসেছেন এবারকার (১৯৫৫) সমাবর্তন উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে। এসেছেন ৬ই পৌষ সন্ধ্যাবেলা। উঠেছেন 'উত্তরায়ণে'। পানিকর আসছেন জেনে আমরা সবাই খুশী হয়েছিলাম। আগে কখনো দেখি নি তাঁকে। তাঁর পাণ্ডিত্য, মেধা ও বিচক্ষণতার কথা শুনেছি ; তাঁর লেখা ইতিহাসের বই উল্টেপাল্টে দেখেছি। কর্মময় তাঁর জীবন। সাংবাদিকতা আর অধ্যাপনা দিয়ে জীবনের শুরু। এককালে দিল্লির হিন্দুস্থান টাইমসের সম্পাদক ছিলেন। দেশীয় রাজ্যে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত

থেকে স্বাধীন ভারতের চীন ও মিশরের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছিলেন, তারপর রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সদস্য। ফাঁকে ফাঁকে লিখেছেন অনেক বই। সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, ইতিহাস। তাছাড়া নিজের মাতৃভাষা মালয়ালমে লিখেছেন এগারোখানা কবিতার বই, পাঁচটি উপন্যাস, পাঁচটি নাটক।

সাতই পৌষ বিকেল চারটে নাগাদ মেলার মাঠের বটগাছটার পাশে চৌবাচ্চার উপর পা ছড়িয়ে বসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলাম আমি আর শুভময় ঘোষ। হঠাৎ দেখি একটি চেনা মুখ মেলায় ঢুকলেন। পরনে ধূসর রঙের প্যান্ট, গলাবন্ধ কোট, হাতে লাঠি, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। ব্যাকব্রাশ করা পাতলা কাঁচা-পাকা চুল, আর চিবুকে সুপরিচিত ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। সমস্ত চোখেমুখে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। বয়স ষাটের কোটায়। চিনলুম ইনিই সর্দার পানিকর, সঙ্গে সেক্রেটারী। আলাপ করার বাসনা নিয়ে সামনে দাঁড়ালুম। বললুম—"আলাপ করতে চাই।" নমস্কার বিনিময়ের পর লাঠিতে ভর করে একটু ঝুঁকে জিগ্‌গেস করলেন—"কি করো এখানে।"

শুভময়কে চোখ টিপে উত্তর দিলুম—"ছাত্র, এখানে পড়ি।"

"কোন্ ডিপার্টমেণ্ট ?"

"ডিগ্রী কলেজ বিদ্যাভবন"—

"কোন্ ইয়ার"—

এই রে, এবার কি বলি। জবাব দিতে দেরি দেখে আবার জিগগেস করেন, "কোন্ ইয়ার ?" আর পালাবার পথ নেই। শেষমেষ মরিয়া হয়ে বলি,—"মাফ করবেন ; সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা বর্তমানে ছাত্র নই। চাকরি করি—এখানকার কলেজে পড়াই। এখানে ছাত্র ছিলুম বছর কয়েক আগে। আমাদের বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে কলেজের ছাত্র হিসেবে আপনার সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালালে আপনি ভাববেন, বাঃ বেশ অনেক কিছু জানে

তো ছেলেটা, আর ঐ বিদ্যেবুদ্ধি মূলধন করে মাস্টার হিসেবে নিজেকে চালাতে বলতে পারেন—উঁহু, নট আপটু এক্সপেকটেশনস্। তাই কি করি, মাস্টারের চেয়ে ছাত্র হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।"

হো হো করে হেসে ওঠেন পানিকর। লাঠিটা মাটিতে দুবার ঠুকে বললেন—"বেশ চালাক ছেলে তো তোমরা। কোন্ সাবজেক্টে এম-এ?"

"আজ্ঞে, দুজনেই বাংলার"—আমি সবিনয়ে জানাই।

"সত্যি বলছ তো? ঠিক করে বল বাংলা না ইতিহাস?"

"কেন, কেন"—এবার আমাদের আশ্চর্য হবার পালা।

"কে জানে, আমি ইতিহাসের লোক আর বাংলা জানি না বলে আসলটা চেপে যাচ্ছ। আমাকে দেখাতে চাও যেন ইতিহাসের ছাত্র না হয়েও ইতিহাসের কত কিছু জান"—পানিকরের কণ্ঠস্বরে কৌতুকের আভাস।

"বিশ্বাস করুন, এটা কিন্তু সত্যি"—শুভময়ের ব্যাকুল উত্তর।

"ঠিক আছে, এবার আমায় মেলা দেখিয়ে দাও। আমি হচ্ছি তোমাদের চীফ গেস্ট।"

"আপত্তি না থাকলে এর আগে এক কাপ চা খেলে হয় না?" আমি জিগগেস করি।

"না, আপত্তি কিসের। চল। আচ্ছা, এখানকার সকলের হাতেই একটা করে ছড়ি দেখছি, ওগুলো কি শান্তিনিকেতনের সবাইকে রাখতে হয়?" পানিকর জিগগেস করেন।

"ঠিক তা নয়। ওগুলো মেলা-স্টিক, পৌষমেলায় যারা আসে, তারাই কেনে।"

"তাহলে তো আমাকেও একটা কিনতে হয়।"

"বেশ চলুন, কিনে দিচ্ছি"—

এক চক্কর মেলা ঘুরে আমরা এগোলাম চায়ের দোকানের দিকে।

পথে সঙ্গ নিল জন ম্যানন, ত্রিবাঙ্কুরের ছেলে—পানিকরের দেশের লোক।

দোকানে ঢুকছি। মনীষীদার সঙ্গে দেখা। শিল্পী মনীষী দে। পানিকরের অতি-পরিচিত। মনীষীদাকে দেখেই পানিকর উচ্ছ্বসিত হয়ে—"হ্যালো হ্যালো" বলে করমর্দন করলেন, কুশলাদি জিগগেস করলেন। মনীষীদাকেও চা খেতে ডাকলুম।

সবাই জড় হয়ে বসেছি দোকানের একটি কোণায়। তখন বিকেল সাড়ে চারটা। সব দোকানেই ভীড়। মিহি, চড়া, মাঝারি নানা কণ্ঠের বিচিত্র কলরব। "ওহে আরও দু কাপ চা। কি মুশকিল ওমলেট দিতে এত দেরি কেন? না না, আমি কিচ্ছু খাব না। বাঃ রে, আমি যে ফিশ-ফ্রাই খাব বললুম। ও মশাই, এদিকে আসুন না, আমায় একটু এ্যাটেণ্ড করুন। আরে অধীর যে, আয় আয় বসে পড়্। বলি খাওয়াচ্ছে কে?"—হরেক রকম আওয়াজে সারা দোকান গম গম করছে। তার সঙ্গে পেয়ালা-পিরিচের ঠুং-ঠাং দু-একটা গানের কলি। পানিকরের মজা লাগছিল। বললেন—"চায়ের দোকানে যারা গোমড়া-মুখে বসে থাকে, তাদের আমি পছন্দ করি না। সবাই হৈ হৈ করবে, একজনের গলা ছাপিয়ে আরেক-জনের গলা উঠবে।"

"আমরা তো তাই করি। আমাদের পছন্দ হওয়া উচিত।"

"তোমাদের ইতিমধ্যেই পছন্দ হয়ে গেছে। তার উপর আমাকে কফি খাওয়াচ্ছ। আচ্ছা মনীষী দের সঙ্গে তোমাদের আলাপ আছে তো?"

গোল্ডফ্লেক টিন থেকে একটা সিগারেট টেনে মনীষীদা বলেন—"আলাপ মানে, দারুণ ভাব।"

"এখন আসছেন কোত্থেকে"—মনীষীদাকে জিগগেস করেন পানিকর।

"আপাতত বাঙ্গালোর থেকে। আমি হচ্ছি ভবঘুরে লোক। আজ এখানে তো কাল ওখানে।"

"কিন্তু আপনাকে এত করে ঈজিপ্ট যেতে বললাম। গেলেন না কেন?"

"যাওয়া হয়ে উঠল না। কখন কোন্ জায়গা ভাল লেগে যায়, আটকা পড়ে যাই"—হেসে জবাব দেন মনীষী দে।

ইতিমধ্যে কফি এসে গেছে। কফির কাপে চুমুক দিচ্ছি, আর এটা-সেটা খুচরো আলাপ চলছে।

"আপনার এই কি প্রথম শান্তিনিকেতন আসা?"—জন ম্যানন মুখ খোলে।

"হ্যাঁ, এই প্রথম। তবে আগে একবার আসার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। কাজের চাপে আসতে পারি নি"—কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে জবাব দিলেন পানিকর।

"কেমন লাগছে শান্তিনিকেতন?" শুভময় শুধায়।

"বেশ ভাল। শান্তিনিকেতনের প্রতি দেশের আস্থা আছে, শ্রদ্ধা আছে। তোমাদের কাছ থেকে দেশ অনেকখানি আশা করে"—

"শান্তিনিকেতনের ছাত্র হিসেবে আমরা গর্বিত"—বললে জন ম্যানন।

"তার সুযোগ নিতেও আমরা ছাড়ি না"—আমি যোগ করি।

"কি রকম?"

"বাইরের লোকেরা আমাদের প্রতি যে একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করে, তা আমরা জানি। তাই শান্তিনিকেতনের লোক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সব সময়ই সচেতন থাকতে হয়। আর বিপদে পড়লে তাকে কাজেও লাগাই। ধরুন—ট্রেনে ভীড়, জায়গা হচ্ছে না, লটবহর নিয়ে নাকানি-চোবানি খাচ্ছি। গলা বাড়িয়ে শান্তিনিকেতনের লোক বলে পরিচয় দিই। জায়গা হয়। মিটিংএ ঢুকতে পাচ্ছি

না—শান্তিনিকেতনের নাম বললাম, আর সঙ্গে সঙ্গেই 'আসুন বসুন' দিয়ে শুরু হয় আপ্যায়নের ঘটা।

"বেশ মজা তো। আমিও শান্তিনিকেতনের ছাত্র হলে পারতাম"—পানিকর বললেন।

আড্ডা জমে উঠেছে, কফির কাপও শেষ। আরেক কাপ অর্ডার দেব কিনা ভাবছি এমন সময় দেখি দোকানের সামনা দিয়ে হন হন করে চলে যাচ্ছে দুটি মেয়ে। দুজনেই বিদেশিনী। হাত নেড়ে ওদের ডাকলাম। আলাপ করিয়ে দিলাম পানিকরের সঙ্গে।

"নাসেক মনস্থুরী, ইজিপ্টের ছাত্রী। লুসী মী, চীন দেশের। দুজনেই কলাভবনে ছবি আঁকা শিখছে।"

"হোআট এ কয়েনসিডেন্স। আমি তো ইজিপ্ট চায়না দু'জায়গাতেই রাষ্ট্রদূত ছিলাম"—পানিকরের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর।

আরো দু কাপ কফির অর্ডার দিয়ে আমি বললাম—"সেই জন্যেই ওদের দুজনকে ডাকা, নইলে আমাদের আসরে অন্যদের ভাগ বসাতে দিতাম নাকি!"

লুসী মীর দিকে তাকিয়ে পানিকর বললেন—"তোমার বাড়ি চায়নার কোন্ খানে?"

"কাংসু।"

"কাংসু? আমি গিয়েছি কাংসুতে। খুব ভাল লেগেছিল। এখানে তোমাদের কেমন লাগছে?"

ভাঙা বাঙলায় দুজনেই একসঙ্গে বললে—"কু—ব বা—লো।"

মনীষীদার দিকে তাকিয়ে পানিকর বলেন—"তোমাদের সঙ্গে এঁর আলাপ নেই? ইনি হচ্ছেন মিস্টার মনীষী দে, এ গ্রেট আর্টিস্ট।"

শুভময় বললে—"উত্তরায়ণে তাঁর ফ্রেস্‌কো দেখ নি?"

মনীষীদা লাজুক হাসি হেসে বলেন—"ওগুলো ছেলেবেলার কাজ, তেমন ভাল নয়।"

"না না, আপনি যে এর চেয়ে ভাল ছবি আঁকেন, তা সবাই জানে। ইউ নো, আই লাইক মনীষী দে'জ ওয়ার্কস।"

"আমরা যাব আপনার ছবি দেখতে—" বললে নাসেক মনসুরী আর লুসী মী।

"যেয়ো।"—মনীষীদার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

শুভময় হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এল একখানা বই হাতে। গুরুদেবের লেখা ইতিহাসের বই—'A vision on Indian History,' বইটি পানিকরের হাতে এগিয়ে দিয়ে বললে—"আজকের স্মৃতি হিসেবে এই বই আমরা আপনাকে উপহার দিতে চাই।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়"—বইটা টেনে পাতা ওল্টান পানিকর। "আচ্ছা, এই বই কবে লেখা? পড়ি নি তো আগে, ভাল করে পড়ে দেখতে হবে।"

"এটা একটা বাঙলা প্রবন্ধের অনুবাদ, সম্ভবত স্যার যদুনাথ সরকার করেছিলেন। আর লেখাও বোধ হয় এই শতাব্দীর একদম গোড়ার দিকে"—শুভময় বলল।

এক ফাঁকে নাসেককে বললাম—"জান নাসেক, কলকাতায় তোমার আঁকা ছবি দেখে এলাম, অল ইণ্ডিয়া আর্টস্ অ্যাণ্ড ক্রাফ্‌টস একজিবিশনে।"

টানা টানা চোখ দুটোকে আরো টেনে খুশীর সুরে নাসেক বলে ওঠে—"সত্যি? জান, আমার দেখা হয় নি। আচ্ছা ক'টা ছবি দিয়েছে আমার?"

"চারটে। লুসী মীর যে পোর্ট্রেটটা করেছ, দারুণ হয়েছে।"

"পোর্ট্রেট গ্যালারীতে সকলের সেরা"—শুভময় যোগ দেয়।

"না না, মোটেই ভাল হয় নি, আমার মত হয় নি, আমার মত হয় নি। আমি কি ও-রকম দেখতে"—লুসী মী চড়া গলায় আপত্তি তোলে।

"তুমি বললে কী হবে, ওটাই তোমার আসল চেহারা"—শুভময়

ফোড়ন কাটে। কৃত্রিম কোপের ভাণ করে লুসী মী পানিকরকে সালিশ মানে।

পানিকর জিগগেস করেন—"কী ব্যাপার ?"

"এই নাসেক আমার মুখের একটি বিচ্ছিরি ছবি এঁকে কলকাতায় এক্সিবিট করেছে। আমি কি সত্যিই খারাপ দেখতে ? আপনিই বলুন না"—লুসী মী অনুযোগ জানায়।

"কে বললে খারাপ দেখতে! তোমাকে তো আমার সবচেয়ে ভাল লাগছে"—পানিকর বলে ওঠেন।

লুসী মী খুশী হল। বলল—"ধন্যবাদ, আপনাকে চীনে খাবার খাইয়ে দেব।"

চীনে খাবার ? চীনে খাবারের কথা উঠতেই পানিকরের মুখে কথার তুবড়ি ছোটে। রন্ধন-বিজ্ঞান যেন তাঁর নখদর্পণে। একশ বছর আগেকার ডিমের কারি, অক্টোপাসের চাটনি, পাখির বাসার ঝোল, হরেক রকম খাবারের ফিরিস্তি ছাড়লেন। আমাদের দৌড় চাঙ্গুয়া, নয়তো ছাতাওয়ালা গলির চীনে দোকানের 'চাউ চাউ' কিংবা 'চিকেন চাউমিন'। লুসী মী আর পানিকর একজন[illegible] আরেক-জন লুফে নিয়ে রান্নার বিস্তারিত বর্ণনা শুরু ক[illegible]। মনীষীদা সমঝদারের মত মাথা নাড়েন। পানিকর বলেন—"সত্যি, রান্না জিনিসটা জানে চীনেরা। আমার মেয়ে কিছু শিখে এসেছে। ওদিকে নাসেক মনসুরী গাল ফুলিয়ে বসে আছে।—"কেন, ঈজিপ্টের রান্না বুঝি আপনার ভাল লাগে না ?"

"মোটেই না, ঈজিপ্সিয়ানরা আবার রান্না করতে জানে নাকি ?"

"বাঃ রে, খান নি 'বাসবুসা ?"

"খেয়েছি।"

"কোনাফা ?"

"তাও খেয়েছি। আরে ও তুটোতো মিষ্টি। তার চেয়ে বাঙলা দেশের রসগোল্লা ঢের ভাল। কী বল তোমরা ?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়"—আমাদের উল্লসিত কণ্ঠস্বর।

"আচ্ছা মিষ্টি না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু 'শার্কাসাইয়া'—মাংসের রান্না—সেটা কি ভাল নয়?"

"ভাল, তবে তাও তো ঈজিপ্টের নিজের খাবার নয়, শিখেছে তুর্কীদের কাছ থেকে। ঈজিপ্টের ভাল যা খাবার আছে, সব নিয়েছে টার্কী বা আরব থেকে। নিজের খাবার ভাল কিচ্ছু নেই।"

মনীষীদা বললেন—"ভাগ্যিস যাই নি ঈজিপ্টে, গেলে তো না খেয়ে মারা পড়তাম।"

"নো নো, কারো কথা বিশ্বাস করবেন না, যাবেন আমাদের বাড়িতে, দারুণ খাবার খাইয়ে দেব"—নাসেক তবু হাল ছাড়ে না।

কথা প্রসঙ্গে চীনা শিল্পী জ্যু পেঁয়োর কথা উঠল। জ্যু পেঁয়ো শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তাব ঘোড়ার ছবির কথা কে না জানে। পানিকর বললেন—"জ্যু পেঁয়োর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল চীনে। অদ্ভুত তাঁর সৃজনী শক্তি। আর কী অমায়িক ব্যবহার। আমাকে অনেকগুলো ছবি উপহার দিয়েছিলেন। চারটে ঘোড়ার, একটি রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথের ছবিটি নিজে রেখে বাকিগুলো ছেলেমেয়েদের বিলিয়ে দিয়েছি। চীনা শিল্পকলা উঁচুদরের। চীনের নানা জায়গায় ঘুরে ছবি দেখেছি। চীনে যখন রাষ্ট্রদূত ছিলাম অনেককে স্কলারশিপ দিয়েছি। চীন ও ভারতে শিল্পী বিনিময় হওয়া দরকার।"

কুদে কুদে চোখে যথাসম্ভব অনুনয় ঢেলে লুসী মী বললে—"দিন না আমাকে একটা স্কলারশিপ, প্লীজ।"

"আর দেবার ক্ষমতা নেই, যখন রাষ্ট্রদূত ছিলাম তখন না হয় চেষ্টা করা যেত"—

"তাহলে আমাকে একটা দিন—অন্ততঃ আমার স্বামীকে, যাতে ইণ্ডিয়াতে এক্ষুনি চলে আসতে পারে"—বললে নাসেক। ঠিক বিয়ের পরদিনই নাসেক এখানে চলে আসে ছবি আঁকা শিখতে।

"একই ব্যাপার। আমার ইজিপ্টের চাকরিও যে গেছে"—হেসে বললেন পানিকর।

আমি তক্ষুনি বললাম—"ঠিক আছে, এরপর যে দেশে আপনি রাষ্ট্রদূত হবেন সেখানকার একটা স্কলারশিপের জন্যে আমি সব আগে আর্জি পেশ করে রাখলাম।"

"রাষ্ট্রদূত হওয়া তো আমার হাতে নয়। সুতরাং কোন আশা নেই"—পানিকর।

মনীষীদা বললেন—"বরং আরেক কাপ কফি খাওয়া যাক। অমিতাভ খাওয়াল, এবার আমি খাওয়াই।"

"No no, one cup is sufficient."

শুভময় বললে—"জানেন, সবাই বলছে আপনি নাকি ঠিক লেনিনের মত দেখতে।"

"That's what Bulganin said to me. কিন্তু আর তো দেরি করা নয়। সন্ধ্যে হয়ে এল, এবার উঠব।" পানিকর বুক-পকেট থেকে ঘড়িটা টেনে সময় দেখেন।

"আবার কখন দেখা হবে"—ওঁঠার মুখে বলে ফেলি।

"কাল বিকেলে এখানে আসুন না"—শুভময় যোগ দেয়।

"কাল বিকেলে তো চলে যাচ্ছি রাজ্যপাল মিঃ মুখার্জির সঙ্গে। আর সকাল বেলা তো তোমাদের সমাবর্তন উৎসব। ঠিক আছে, সমাবর্তন উৎসবের পর"—

"কখন, কখন ?"—

"এই ধর, এগারোটা নাগাদ।"

"আসবেন তো ?"

"নিশ্চয়। আচ্ছা গুড্ বাই। কাল আবার দেখা হবে।"

পানিকর চলে গেলেন উত্তরায়ণে।

পরদিন ৮ই পৌষ। সকাল সাড়ে আটটায় আম্রকুঞ্জে সমাবর্তন। প্রধান অতিথি পানিকরের ভাষণ গতানুগতিকতার বাঁধা সড়ক ছেড়ে

নূতনত্বের আস্বাদ দিল। তাঁর স্পষ্ট ভাষণ নির্ভীকতার জন্যে উল্লেখ-যোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে খোলাখুলি মত দিয়েছেন। নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে নিজস্ব ক্ষমতার গুণে ভারতে এক নূতন সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছে। আজ যদি কেউ আধ্যাত্মিক ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্যে তপোবনের আদর্শে বিশুদ্ধ ভারতীয় জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন তবে তা অর্থহীন হবে। বর্তমান ভারত আর অতীতের নিজস্ব চিন্তাধারার উত্তরাধিকারী নয়। আজ ভারতে দেখা যাচ্ছে নূতন সভ্যতা, পুরাতন সভ্যতার কেবলমাত্র ধারাবাহিকতা নয়। তাই যাঁরা ভারতবর্ষকে ভালোবাসেন তাঁদের উচিত হবে নূতন সভ্যতাকে শক্তিশালী করা, যে সভ্যতা বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে সৃষ্ট।

সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষ হল সাড়ে দশটায়। এগারোটায় পানিকরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নি। বন্ধুবান্ধবরা আড্ডা মারছিল চায়ের দোকানে। দলে ভিড়ে পড়লাম। ঠিক এগারোটা বাজতেই পানিকর হাজির। সঙ্গে বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট ও ময়ূরাক্ষী প্রজেক্টের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটর শ্রীরঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ ছ' ফুট পেশীবহুল চেহারা। আমরা কাছে গেলাম।

পানিকর বললেন—"এই যে এসেছ। কাল তো মেলা দেখা হয় নি। আজ মেলা দেখাও।"—

"বেশ চলুন।"

পানিকর আর মিঃ ব্যানার্জিকে নিয়ে আমরা আস্তে আস্তে এগোই। উত্তরের পীচ করা রাস্তা ঘেঁষে মিষ্টির দোকানের সারি, হরেক রকমের মিষ্টি থাকে থাকে সাজানো। অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার নেতাজী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই লাইন ধরে উত্তরায়ণের সীমানার সমান্তরাল রেস্তোরাঁর সারি। এখানেই বেশি

ভিড়। মিষ্টির দোকানে গ্রামের লোকের আনাগোনা, আর এদিকটায় শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন, বর্তমান ছাত্র আর কলকাতার অতিথির হট্টগোলে জম-জমাট। শীতের পোশাকের বাহার, রঙ-বেরঙের শাড়ি, নেকটাই, লেটেস্ট ডিজাইনের কোট, ওভারকোট আর উচ্চকিত হাসির ঝলমলানি। এতো খেতেও পারে লোকেরা। জিবে শান দিতে দিতে ঘুরে বেড়ায় খাবার দোকানে। "সন্ধ্যে পাঁচটায় দেখা কর।" "কোথায় ?" "কালোর দোকানে।" "ভিড়ে হারিয়ে গেলে কী করব ?" "পৌষালিতে দাঁড়িয়ে থেক।" "দুপুরবেলা কী করছ ?" "কিচ্ছু না, চলে এস মধুচক্রে।"—সব কিছুই এই রেস্তোঁরাগুলো কেন্দ্র করে।

খাবার দোকানের পর আমরা এগোই স্টলের দিকে। মনোহারী নানা জিনিস, খেলনা, শ্রীনিকেতনের প্রোডাক্টস্, হাতীর দাঁতের কাজ, কাঠের কাজ, কাশ্মীরী শাল, কটকী শাড়ি—নানা জিনিসে বোঝাই। মাঝখানে ফাঁকা মাঠে যাত্রা, কীর্তন, কবিগানের বাঁধা আসর। ফাঁকা মাঠে ছড়ি হাতে ঘুরছে ছেলেমেয়েরা, কেউবা বসে বসে চিবোচ্ছে বাদামভাজা। মেলাকে দুভাগ করে রেখেছে রতনকুঠী যাবার রাস্তা। ও পাশেই বেশি ভিড়। পুঁতির মালা, সাঁওতালী গয়না, জুতো, জামা, বাসনকোসন, ফটো স্টুডিও, বটতলার বই, লোহালক্কড়—লাইনের পর লাইন চলেছে। রাস্তার ওপারে বিদ্যাভবন হোস্টেলের কাছে কেবল মাটির হাঁড়ি আর কাঠের ফার্নিচার, দরজা জানলা ইত্যাদি। রাস্তার এধারে মন্দিরের পাশে মেলা-অফিস, টীকে দেবার ঘর, আর ঝুরি-নামা বটের তলায় বাউলের আড্ডা। গানের পর গান চলছে। বাউলরা বলে 'রবিঠাকুরের মেলা।' যেমন কেন্দুলিতে 'জয়দেবের মেলা।' রাস্তায় দু'পাশে খুচরো জিনিসের দোকান—বেলুন, বাঁশি, ছড়ি আর চানাচুরের চীৎকার।

নাগরদোলার সামনে আসতেই বললাম—"উঠবেন নাকি নাগরদোলায় ?"

"বয়স নেই"—বললেন পানিকর।

"কেন? পণ্ডিত নেহেরু যখন এসেছিলেন গত ১৯৪৫ সালে কন্যা ইন্দিরাকে নিয়ে, নাগরদোলা চড়েছিলেন।"

"সে পণ্ডিতজীর পক্ষেই সম্ভব"—বলতে বলতে এগোন পানিকর। হঠাৎ থেমে বলেন—"আচ্ছা, মেলা তোমাদের কী রকম লাগে?"—

"দারুণ। সারা বছর মেলার জন্যে অপেক্ষা করি। পৌষ উৎসব কবে আসবে। ঠিক বাঙলাদেশের দুর্গাপূজার মতন। দুর্গাপূজায় যেমন সপ্তমী অষ্টমী, নবমী, তেমনি আমাদের সাতই, আটই ও নয়ই পৌষ। ১০ই পৌষ ভাঙা মেলায় দশমীর বিসর্জনের করুণ বাজনা শুনতে পাই। ষষ্ঠীর বোধনের মত ৬ই পৌষ থেকে আমাদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। দূর দূরান্তর থেকে আসেন অতিথির দল, বিশেষ করে প্রাক্তন ছাত্রেরা। যে যেখানে আছেন 'পড়ি কি মরি' করে ছোটেন শান্তিনিকেতন। মনের টানে। যে আসতে পারল না মুখ গোমড়া করে দিন কাটায়। এইতো সেদিন আমাদের বলছিলেন সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিস শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ। সাতই পৌষ এলে কাজে মন বসে না, যত কাজই থাকুক। তাঁর সহকর্মীরাও এই দুর্বলতা জেনে গেছেন। তাই ডিসেম্বর এলেই তাঁকে জিগগেস করেন—'কী, কবে শান্তিনিকেতন রওয়ানা হচ্ছ?'

"আর আমরা যারা এখানে আছি তারা সকাল থেকে রাত্তির পর্য্যন্ত টো টো করে ঘুরে বেড়াই, এ দোকান থেকে ও দোকান। ফাঁকে ফাঁকে অনুষ্ঠানে উপস্থিতি। কবির লড়াই থেকে বাউল গান, নাগরদোলা থেকে সাঁওতাল স্পোর্টস। সমে সমে চায়ের দোকানে আড্ডা। রাত্তিরে আসর জাঁকিয়ে যাত্রামণ্ডপে। এক মিনিট ঘরে থাকি না। মেলা ছাড়লেই মনে হয় বুঝিবা কিছু একটা মজা থেকে বাদ পড়ে গেলাম।"

কথা বলতে বলতে চলেছি, পানিকর আসলেন এক টুপির

দোকানে। মিঃ ব্যানার্জিকে জিগগেস করলেন—"শান্তিনিকেতনের এক ধরনের মাথার টুপি আছে শুনেছি, সেগুলো কি এই ?"

মিঃ ব্যানার্জি বললেন—"না, সেগুলো তালপাতার তৈরি, নাম টোকা। চান নাকি একটা ?"

"পেলে তো বেশ ভাল হয়।" বললেন পানিকর।

মিঃ ব্যানার্জি আমাদের দিকে তাকিয়ে জিগগেস করলেন, "কোথায় পাওয়া যেতে পারে।"

শুভময় বললে—"মেলাতে মিলবে না, তবে জোগাড় করে দিতে পারি।"

"বেশ, তাহলে উত্তরায়ণে নিয়ে এস, তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করব। আমি এবার চলি।"

পানিকর চলে গেলেন। আমরা বেরুলাম টোকার খোঁজে। কোথায় পাই, কোথায় পাই। দোকানে তো মিলবে না, কারো কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে নিতে হবে। ভাবছি আর হাঁটছি; হঠাৎ দেখি পাঠভবনের নন্দিতা নামে একটি মেয়ে টোকা মাথায় দিয়ে হেলতে দুলতে চলেছে। শুভময় দৌড়ে ছুটে তার মাথা থেকে টোকা ছিনিয়ে নিলে চিলের মত ঝাপটা মেরে। বললে—"পরে তোমায় জোগাড় করে দেব, এখন ভীষণ দরকার।" মেয়েটার মুখ থেকে কোন কথা বেরোবার আগেই আমরা দে ছুট। সোজা উত্তরায়ণ।

উদয়নের সামনে মিঃ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা। বললেন—"বাঃ চটপট নিয়ে এসেছেন তো! কোথায় পেলেন ?"

শুভময় বললে—"একটি মেয়ের মাথা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি।"

মিঃ ব্যানার্জি পেশীবহুল হাতে খপ করে শুভময়ের লিকলিকে হাতটা ধরে হেসে বললেন—"ছিনিয়ে এনেছেন ? তাহলে তো পুলিস কেস। ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আমার একটা দায়িত্ব আছে তো।

চলুন আপনাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাই মিঃ পানিকরের কাছে—" বলেই টানতে টানতে ছুটলেন পেছনের বাগানের দিকে, যেখানে পানিকর বেড়াচ্ছেন নাসেক আর লুসী মীর সঙ্গে।

যেতে যেতে আমি বললাম—"আমরা ছিঁচকে চোর, পড়েছি রঘু ডাকাতের হাতে, কিছুটা নাজেহাল হতে হবে বই কি!"

উত্তরায়ণের সুন্দর সুসজ্জিত বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পানিকর, হিমঝুরি আর আমলকী গাছের ফাঁক দিয়ে বেরিয়েছে লাল কাঁকরের রাস্তা, দুপাশে ফুলের বাহার। টোকা পেয়ে পানিকর মহা খুশী। মাথায় পরতে পরতে বললেন—"বাঃ, চমৎকার জিনিস।" আমি বললাম—"গান্ধীজীরও এই রকম টোকা ছিল। নোয়াখালিতে ঘুরে বেড়ানোর সময় মাথায় পরতেন।"

ওদিকে শুভময় ব্যাগ থেকে দুখানা বই বের করে ফেলেছে। দুখানাই পানিকরের লেখা। Geographical factors in Indian History এবং A Survey of Indian History.

উত্তরায়ণের পশ্চিম দিকের বাগানে কৃত্রিম লেকটার কাছাকাছি আসতেই শুভময় বললে—"আপত্তি না থাকে তো আপনাকে একটি কথা জিগগেস করি।"

"কী বল?"

"এই বইটাতে কিছু ভুল আছে। এক জায়গায় আপনি লিখেছেন মহর্ষি দ্বারকানাথ ঠাকুর। তা তো নয়, ওটা হবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, গুরুদেবের পিতা।"

"হ্যাঁ, ওটা ভুলই হয়েছিল, পরের সংস্করণে সংশোধন করেছি।"

"আরেকটা কথা। আপনি লিখেছেন যে, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রভাবে হিন্দুধর্মের 'রিভাইভাল' হয়েছে, কিন্তু তা কি ঠিক?"

"আমি বলতে চেয়েছি দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন,

তাই ব্রাহ্মধর্ম ঠিক আগেকার মত রইল না। বস্তু হিন্দু আদর্শের নূতন রূপ নিল।"

তারপর ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাব, বর্তমান অবস্থা, রামমোহন রায় ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা ইত্যাদি নানা বিষয়ে আমরা আলোচনায় মত্ত। লুসী মী এসে আপত্তি তুলল—"না, এ হয় না, তোমরা দুজন এলে আমাদের আর কথা বলা হয় না। তোমরা ছিলে না, বেশ গল্প করছিলাম।"

পানিকর হেসে বলেন—"কী, এদের হিংসে হচ্ছে বুঝি? আচ্ছা বেশ, তোমাদের সঙ্গে কী নিয়ে আলাপ করব? চীনে খাবার? মিশরের পিরামিড? দক্ষিণ ভারতের মন্দির? নাগা নাচ? কাশ্মীরের কুটির-শিল্প? অক্সফোর্ডের উচ্চারণ? কোনটা?"

"সত্যিই আপনি কত ভাগ্যবান। কত দেশ, কত জায়গা ঘুরেছেন।"—বললে নাসেক।

"বাই জোভ্, একে তুমি ভাগ্য বল? আমি তো ঘুরে ঘুরে হয়রান। আর ভাল লাগে না। একবার ভাবি, এখন কিছুদিন দেশে থেকে বিশ্রাম নিই, বই-টই লিখি। কিন্তু আমার ভাগ্যে তা নেই।"

"কেন?"

শিগ্গির বিদেশে যেতে হবে। ডিপ্লোম্যাট-এর জীবন কাটাতে ভাল লাগে না।"

"আপনার 'In two China's' পড়ে তো তা মনে হয় না।"

"সে জোর করে ভাল লাগিয়েছি। কনভোকেশন অ্যাড্রেস্ কেমন লাগল?"

"আনকনভেন্শনাল"—বললে শুভময়।

"র‍্যাদার কন্ট্রাভারশিয়াল"—আমি যোগ দিই।

"আপনি যা বলেছেন তা অনেকাংশে সত্যি, কিন্তু আপনার ভয়টা অমূলক। আমরা কেউই পুরানো ভারতে ফিরে যেতে চাই না।"

"তুমি না চাইতে পার, অনেকেই চায়। আর তাদের নিয়েই ভয়। আমাদের তাকাতে হবে ভবিষ্যতের দিকে, নূতন সমাজ গঠনের দিকে। পেছন-ফেরা মনোভাব তাড়াতে হবে দেশ থেকে। I say always truth, even unpleasant truth. চায়নাতে অনেক ইউনিভার-সিটিতে convocational address দিয়েছি, সেখানেও"—

"Unpleasant truth বলেছিলেন কি?"—মাঝখানে বলল জন ম্যামন—

"Oh yes, surely."—দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে পানিকরের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ফুটে ওঠে।

এমন সময় মিঃ ব্যানার্জি হাজির সুধাকান্তদাকে নিয়ে। আলাপ করিয়ে দিলেন—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী; এককালে গুরুদেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন—and he is full of anectodotes. সুধাকান্তবাবুর একটা গল্প বলি শুনুন—রোজ বিকেলে রবীন্দ্রনাথ এক গ্লাস কী যেন খান, সুন্দর টকটকে তার রঙ। সুধাকান্তবাবু ভাবেন, নিশ্চয়ই সুস্বাদু কোন জিনিস, অথচ কী আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথ একদিনও তাঁকে খেতে বলেন না। একদিন রবীন্দ্রনাথ টের পেলেন তাঁর মনোবাসনা, ডেকে বললেন—'কীরে খাবি নাকি এক গ্লাস।" সুধাকান্তবাবু হাতে স্বর্গ পেলেন, যাক এতদিনে গুরুদেবের সুমতি হল। ঢক ঢক করে গিলতে গিয়ে দেখেন, ওমা এ যে নিমের জল। ঈস্ কি তেতো। রবীন্দ্রনাথের মুখে কৌতুকের হাসি। পানিকরও হেসে ওঠেন। কিন্তু আমরা মিঃ ব্যানার্জির কাণ্ড দেখে একেবারে 'থ'। এ যে উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপল। আমরা তো শুনেছি, প্রমথনাথ বিশি মশায়ের এরূপ হয়েছিল। লিখেছেনও 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' বইটাতে। যাক গে, চেপে গেলাম। সুধাকান্তদা অন্যের গল্প বেশ হজম করে নিয়ে বললেন—"কী আর করি, সকলের সামনে পেছপা হলে চলবে কেন, অক্লেশে গলাধঃকরণ করে বললাম—বাঃ, খেতে বেশ তো। উপস্থিত সকলে ঈর্ষার দৃষ্টিতে

তাকাল আমার দিকে। আসল রহস্য বুঝলাম আমি আর গুরুদেব।”

ততক্ষণে আমরা পিছনের বাগান পেরিয়ে উদয়নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। সামনে টেনিস কোর্ট, গোলাপ বাগান। আর মেলার হাঁকডাক।

পানিকর জিগগেস করলেন—“আচ্ছা, এটার নাম উত্তরায়ণ কেন?”

“বাড়িটার নাম উদয়ন, পুরো কম্পাউণ্ডটার নাম উত্তরায়ণ।” —বললে শুভময়।

“কিন্তু উত্তরায়ণ নাম কেন?”—বলে পানিকর সিগারেট কেস খুললেন।

আমি বললাম—“বাড়িটা শান্তিনিকেতনের উত্তরে। আশ্রমের উত্তরাপথে রবির আবাস, তাই নাম উত্তরায়ণ।”

“মহাভারতের ভীষ্মের শরশয্যার কথা পড়েছ তো?”—সিগারেটে আগুন ধরিয়ে কৌতুকের সুরে পানিকর বলেন—“কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম শরশয্যায়। তিনি ইচ্ছা-মৃত্যুর অধিকারী, তাই অপেক্ষা করছিলেন উত্তরায়ণ সংক্রান্তির। কামনা করেছিলেন তখন যেন তাঁর মৃত্যু হয়। গুরুদেবেরও কি সেই রকম ইচ্ছে হয়েছিল? তিনিও কী ওই মত কামনা করেছিলেন উত্তরায়ণে থেকে?”

“আচ্ছা শ্যামলীটা দেখেছেন?”

“দেখেছি, খুব সুন্দর বাড়ি। ভারি ভাল লেগেছে। আরো ভালভাবে এ-বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত।”

“কেমন লাগল শান্তিনিকেতন?”

“খুব ভাল।”

“আবার কবে আসছেন?”

“শীগগির আসছি না। অন্তত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে নয়। তবে দেখা হয়ত হবে”—বুক পকেট থেকে ঘড়িটা বের করেন পানিকর

—"আজ চলি, তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম। তোমাদের কথা মনে থাকবে। সাড়ে বারোটা বাজে, খেয়ে দেয়ে রওনা হতে হবে।"

"আচ্ছা, নমস্কার। ফির মিলেঙ্গে।"

"ফির মিলেঙ্গে"—উদয়নের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে পিছন ফিরে তাকিয়ে হাত নেড়ে বললেন পানিকর।

পণ্ডিতজী কি জয়

পণ্ডিত নেহরু যখন প্রধানমন্ত্রী নেহরু হন নি, তখন থেকেই আমরা শান্তিনিকেতনীরা তাঁকে বরাবর ঘরের লোক বলেই জেনেছি। ১৯৪৫ সালে পৌষ মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। এক মাঠ লোকের মাঝখানে ইন্দিরাকে নিয়ে হাজির জওহরলাল! লাফ মেরে আমাদের সঙ্গেই উঠে পড়লেন নাগর দোলায়। ১৯৫৪ সালের পৌষ উৎসবে কিচেনে খেতে বসেছি। শালপাতায় পড়েছে গরম খিচুড়ি। হঠাৎ পাশে এসে যিনি বসলেন, তিনি জওহরলাল। তার পাতের খিচুড়ি আমার আগেই সাবাড়।

এই হচ্ছেন নেহরু। এবং শান্তিনিকেতনে গেলে তিনি অন্য মানুষ। হাসিতে উচ্ছল, তারুণ্যে উদ্দাম, গতিতে দুরন্ত। তিনি নিজেই অনেকবার বলেছেন—"এখানে এলে আমার বয়স কমে যায়।"

শান্তিনিকেতন ছেড়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিই। ১৯৫৬ সালে। সাংবাদিক হিসেবে তখন থেকে নেহরুর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতা। সভা সমিতি সাংবাদিক সম্মেলন এবং ঘরোয়া পরিবেশে নানান রূপে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। এই বহুরূপের মাঝখানে দুটি দিনের স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

১৯৬২ সালের ৫ই জানুয়ারী। সেবার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসেছে পাটনায়—পরলোকগত ডঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের স্মৃতিপূত শ্রীকৃষ্ণপুরীতে। আমিও সাংবাদিক হয়ে গিয়েছি ৬৭তম এই অধিবেশনে যোগ দিতে।

নানা উচ্ছৃংখলতায় এই অধিবেশন বিস্মৃত হবার নয়।

গণ্ডগোলের শুরু কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির শোভাযাত্রা দিয়েই। তারপর প্রতি অধিবেশনেই একটা না একটা অনর্থ ঘটে। অনর্থের মূল জনতার চাপ, অস্বাভাবিক ভিড়।

সেদিন ছিল প্রকাশ্য অধিবেশন। দুপুর দু'টোর মধ্যেই দেখা গেল মঞ্চটি ছাড়া পঁচাত্তর একর সভাস্থলীর প্রতিটি ইঞ্চি জন-স্রোতে ভাসছে। চারদিকে কালো কালো মাথা। মাথায় গামছা, হাতে কম্বল। বিহারের প্রায় পাঁচলাখ সাধারণ মানুষ গোটা শ্রীকৃষ্ণপুরী পঙ্গপালের মত ছেয়ে ফেলেছে। এবং সবাই ছুটছে।

তিনটেয় কার্যসূচী আরম্ভ হবার কথা। বেলা আড়াইটায় প্রেস গেট দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করে দেখি অসম্ভব ব্যাপার। পাদমেকং এগোবার উপায় নেই। আমাদের গ্যালারি জনতার দখলে।

সামনে তাকিয়ে দেখি হন্তদন্ত এবং গলদঘর্ম শ্রীজগজীবন রাম —অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান। তিনি বললেন—কিন্তু কিছু করা সম্ভব নয়। ইমপসিবল্। এ-আই-সি-সি'র সদস্যরা পর্যন্ত ঢুকতে পারছেন না। তাঁদের আসনও বেদখল।"

খানিক পরেই দেখি শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ। তাঁরা সভামঞ্চের দিকে এগোচ্ছেন। দুই বিপুল-বপুর মাঝখানে গা ঢাকা দিয়ে পিছু ধরলাম এবং সেবাদলের লোকদের চোখে ধুলো দিয়ে একলাফে মঞ্চের এক কোনে।

সামনে চোখ মেলতেই গা গুলিয়ে গেল। শুধু মাথা। অসংখ্য মাথা। আর কানে শুনতে পেলাম কোটি কোটি ভ্রমরের পক্ষ বিধুননের 'হুম হুম' আওয়াজ। এদিকে মাইকের বৃথাই কাতর আবেদন 'বৈঠ যাইয়ে বৈঠ যাইয়ে'।—ভিড় মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে।

৩-১০ মিনিট। মঞ্চে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রবেশ। পেছনে নেহরু। ব্যস, তৎক্ষণাৎ দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ-

বিক্ষোভে মঞ্চের এই ছোট দ্বীপটি পলকে টলমল। জনতা তিন-দিক থেকে ধেয়ে আসছে।

নেহরু মাইকের সামনে এগিয়ে গেলেন। ধমক দিয়ে বললেন —'ক্যায়া তামাসা হো রহা হ্যায় ?'

জনতা তবু অশান্ত। নেহরু গলা ফাটিয়ে চীৎকার দিলেন— 'বৈঠ যাইয়ে।' কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা ! জনতা আরও এগিয়ে মঞ্চ ঘিরে ধরেছে। মুহূর্তের মধ্যে মঞ্চ ডুববে।

জনতা চীৎকার দিল—'পণ্ডিতজী কী জয়।' নেহরু ফিরে তাকালেন, দু বার এদিক ওদিক পায়চারী করলেন তারপর হঠাৎ চেহারার বদল। যেন সিংহ, রাগে গরগর। জনতার তখনও চীৎকার—'পণ্ডিতজী কী জয়।'

মুহূর্তে রূপ বদল। উত্তেজনা যখন চরমে হঠাৎ তাকিয়ে দেখি নেহরু লাফ মেরে এগোলেন। তাঁর চোখে কীসের যেন হাতছানি, খানিক থমকে নির্নিমেষ চেয়ে রইলেন উত্তাল জনসমুদ্রের দিকে। আবার এক পা এক পা করে এগোলেন। নেহরুকে জনতায় পেয়েছে।

জনতা নেহেরুকে ডাকছে। তিনি আর এখানে থাকবেন না। ঝাঁপ দেবেন, তারা ডাকছে। তারা এগিয়ে আসছে। তাদের মুখে পণ্ডিতজী কী জয়। তারা নেহরুকে দেখতে চায়। কাছে পেতে চায়।

নেহরু দু'হাত বাড়িয়ে লাফ দিতে গেলেন। খপ করে বাবার হাত ধরে ফেললেন ইন্দিরা। চীৎকার করলেন "পাপা পাপা ; ইয়ে আপ ক্যা করতে হৈ ?"

নেহরু : ছোড় দো, মুঝে ছোড় দো।

ইন্দিরা : নহী, নহী, আপকা জীবন কি কিমৎ বহুৎ হৈ।

জনতায় অনেক ধরণের লোক। ইন্দিরা শঙ্কিত, কিন্তু নেহরু কন্যার হাত ঠেলে আবার এগোলেন জনতার সামনে। ইন্দিরা 'পাপা

পাপা' বলে পেছনে ছুটলেন। আবার হাত জড়িয়ে মিনতির সুরে বললেন—why do you behave in such a manner ?"

মঞ্চে আমি হতভম্ব, যেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকের সাজাহান জাহানারার কথোপকথন শুনছি।

সব নেতারাও হতভম্ব। মোরারজি দেশাই, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ডেবর ভাই, পাটিল, স্বর্ণ সিং, বিনোদানন্দ ঝা—সকলে। এদিকে জনতা বাঁশের বেড়া ভেঙেচুরে মঞ্চে উঠে পড়ছে। তাদের মুখে—পণ্ডিতজী কী জয়।"

গলায় আদর মেখে নেহরু কন্যাকে বলেন—"তুমহারি লিয়ে হমারী জানকে কিমৎ জাদা হৈ, লেকিন জন্‌তা মুঝে উহ্‌া বোল রহী হৈ, তুম্ কিউ মুঝে রুকতি হো ?"

ইন্দিরা নাছোড়বান্দা। বাবার হাত জাপটে ধরে আছেন। পিসি বিজয়লক্ষ্মীও ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনিও ভাইকে জনসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে দেবেন না। কিছুতেই না।

নেহরু হঠাৎ এক ঝটকায় মেয়ের এবং বোনের হাত সরিয়ে দিয়ে চীৎকার পাড়লেন: "মুঝে জানে দো, মুঝে ছোড় দো—"

বাপের বেটি ইন্দিরার গলা আরও চড়া। "নহী নহী, হম কিসি হালৎসে আপকো নহী জানে দে সকতী।"—কিছুতেই যেতে দেব না।

নেহরু মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। চোখ নত করলেন। কন্যা-স্নেহের কাছে হার মেনে ওইখানেই বসে পড়লেন তাকিয়া হেলান দিয়ে।

আমি রুদ্ধশ্বাসে সব শুনছি, সব দেখছি। আর একজনও সাংবাদিক আমার সঙ্গে নেই। সবাই বাইরে, ঢুকতে পারেন নি। আমি মহা সৌভাগ্যবান।

এদিকে কী সর্বনাশ! নেহরু আবার লাফিয়ে উঠেছেন। তাকিয়া লাথি মেরে সরিয়ে দিয়েছেন। আবার তিনি সেই ডাক শুনতে

পেয়েছেন—'পণ্ডিতজী কী জয়', । জনতা তাঁকে ডাক দিয়েছে। তাকে জনতায় পেয়েছে। নেহরু জনতাকে লক্ষ্য করে সামনে ঝাঁপ দিলেন।

সেই মুহূর্তে পুরোপুরি নাটক। তাকে অতিকষ্টে লুফে নিলেন রামসুভগ সিং আর রামলক্ষ্মণ সিং—দুই কর্মকর্তা। অন্য দিক থেকে ছুটে এসেছেন সিকিউরিটি অফিসার গোপাল দত্ত। পেছন থেকে ধরেছেন আর একজন ভদ্রলোক।

নাটকীয় মুহূর্তটি উঠল চরমে। পায়ে ঠক ঠক কাঁপা আমি দেখি নেহরু রুখে দাঁড়িয়েছেন। পেছন ফিরে ওই ভদ্রলোককে মারলেন এক বিরাশী সিক্কা ঘুষি। নেহরুর চোখে মুখে অস্থির অসুস্থতা।

অভ্যর্থনা সমিতির দুই পাণ্ডা নেহরুকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে গেলেন পেছনের এক ঘরে। দিলেন দরজা বন্ধ করে। জনতায় পাওয়া নেহরু বন্দী।

কিন্তু এদিকে সব নিষ্ফল. জনতা তখনও উচ্ছৃঙ্খল। তখনও পাঁচলাখ কণ্ঠে, 'পণ্ডিতজী কী জয়।'

বেলা সাড়ে তিনটায় কোনক্রমে সভার কাজ শুরু হল। এই গণ্ডগোলের মধ্যে কারা যেন ভজনগান শুরু করলেন। রঘুপতি রাঘব রাজারাম। জনতা মজা পেয়ে ধুয়া ধরল—"জয়-জয়, রঘ্ঘুপত্তি—"

সভাপতি শ্রীরেড্ডি মাইকের সামনে গিয়ে বললেন, "আমার ইংরেজি ভাষণ বিতরণ করা হয়েছে। ধরে নিন্ বক্তৃতাটা পড়া হয়ে গেছে।"

সত্যনারায়ণ সিংহ উঠলেন হিন্দি অনুবাদ পাঠ করতে। এক লাইনও পড়া হল না। জনতা লাফিয়ে উঠে পড়তে লাগল মঞ্চে। তারা নেহরুকে দেখবে, তাঁর চরণস্পর্শ করবে।

অবাক কাণ্ড করে বসলেন ইন্দিরা গান্ধী সেই মুহূর্তে। আরও দু'জন মহিলার সঙ্গে দুঃসাহসিক ঝাঁপ দিয়ে তিনি নেমে পড়লেন

মঞ্চের নীচে এবং জনতা আর মঞ্চের মাঝখানে বসে রইলেন গ্যাঁট হয়ে। যদি এগোতে হয় ইন্দিরাকে মাড়িয়ে যেতে হবে।

এতে কিছু কাজ হল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! পেছনের ঠেলায় সামনের লোকগুলো ততক্ষণে হুড়মুড় করে আবার মঞ্চে উঠছে তো উঠছেই। কংগ্রেসকর্মী শ্রীলাবণ্যপ্রভা দত্তের কোলে ছিল অন্যান্য মহিলার হাতব্যাগ স্কার্ফ ইত্যাদি। তিনি ভয়ে বেতসপাতা। সম্পাদিকা আভা মাইতির মুখ ফ্যাকাশে। বিজয় সিং নাহার ছুটতে গিয়ে হারালেন জুতোর পাটি, নেহরুর বুকের গোলাপ নীচে গড়াগড়ি। একটি মেয়ে আমার সামনেই মূর্চ্ছা গেল। ফটকের বাইরে পুলিশের লাঠিচার্জ। জনতার ভেতর মারামারি। আমি মোরারজি দেশাইয়ের কনুয়ের এক জোর ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়লুম ক্ষীণতনু ডেবর ভাইয়ের কোলে।

চীৎকার, চেঁচামেচি, ঠেলাঠেলি এবং কান্নাকাটিতে তুলকালাম কাণ্ড। কে একজন তখন মাইক আঁকড়ে ভয়ার্ত গলায় বললেন: "বিহারকে বাহাদুরো, পিছু হট যাও।"

বাহাদুর জনতা জবাব দিল: "বাহাদুর কভি পিছু নহি হটতা।"

কর্মকর্তারা হতোদ্যম। শেষ সম্বল নেহরু। বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে তাঁকে আনা হল মঞ্চে। এবারে শেষ চেষ্টা।

বেলা ৪-৩০ মিনিট। নেহরু ততক্ষণে শান্ত। চোখের মনিতে সেই অস্থিরতা নেই। ঠাণ্ডা গলায় বললেন—"আপনারা আমাকে বলতে দিলেন না।"

জনতা চীৎকার দিল—'পণ্ডিতজী কী জয়।'

নেহরু: আমাকে যখন কিছু বলতে দিলেন না, আমি চলে যাচ্ছি।

জনতার ফের চীৎকার—'পণ্ডিতজী কী জয়।'

নেহরু—সভা খতম হো গিয়া।

জনতা—'পণ্ডিতজী কী জয়।'

অবসন্ন নেহরু বাইরে এলেন। খোলা একখানি গাড়ি তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। জনতা জয়ধ্বনি দিল—'পণ্ডিতজী কী জয়।'

নেহরু গাড়িতে উঠলেন। জনতা চুরমার করে গাড়ি ছুটল রাজভবনের দিকে। জনতা চীৎকার দিল—'পণ্ডিতজী কী জয়।'

সংঘাতসংকুল নাটকের চেয়েও রোমাঞ্চকর. রূপকথার কাহিনীর চেয়েও বিস্ময়কর এই ঘটনার শেষ এইখানেই। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রায় তিনশত জন মূর্চ্ছিত, শ দেড়েক লোক আহত এবং শতাধিক লোক নিখোঁজ।

আর আমি? বিস্মিত বিমূঢ়। নেহরুর এমন চেহারা আগে কোনদিন দেখি নি। এই বিপুল জনতার অধিকাংশই গ্রামের লোক। আরা ছাপরা চম্পারণ ভাগলপুর বালিয়া থেকে দলে দলে এসেছে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নেহরু দর্শন। শুধু নেহরুর মুখের কথা শুনে তারা তুষ্ট নয়, তাঁকে কাছে পেতে চায়। পারলে চরণ স্পর্শ করে ধন্য হতে চায়।

এই দুর্লভ জনপ্রিয়তার কাছেই নেহরু, এই পরাজিত হলেন সর্বপ্রথম। দীর্ঘ দেড়ঘণ্টা তিনি নানা ভাবে জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। কখনও ক্রোধে ফেটে পড়ে, কখনও সোহাগ ঢেলে। কিন্তু পারেন নি। সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। মদমত্ত মাতঙ্গের গতির মত জনস্রোত কোন কথায় কর্ণপাত না করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে এসেছে। কণ্ঠে তাদের একটিমাত্র ধ্বনি—'পণ্ডিতজী কী জয়।' এবং ওই ধ্বনি দিয়ে জনতায়-পাওয়া পণ্ডিতজীকে তারা মঞ্চ থেকে বিদায় করে দিয়েছে।

এদিনের এই ঘটনার পর অনেকদিন নেহরুর সঙ্গে আমার দেখা নেই। ইতিমধ্যে ভারতের বুকে ঝড় বয়ে গেছে। চীন ভারত আক্রমণ করেছে। দেশে জাতীয় সংকট ঘোষিত হয়েছে। এবং

শ্রীকৃষ্ণপুরীতে দেখা সেদিনের সেই নেহরুকেই দুবছর পর দেখলুম অন্য রূপে। তেজপুরে।

১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে নেফার বিভিন্ন এলাকা ঘুরতে ঘুরতে আমি এসেছি তেজপুর। চীনারা তখনও বমডিলায়। তেজপুর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর।

নেহরু নতুন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী যশোবন্ত রাও চ্যবনকে নিয়ে এলেন ৬ই ডিসেম্বর। তিনি যখন বিমান থেকে নামলেন তেজপুরের আকাশে রক্ত সন্ধ্যা। নেহরুর বাদামী আচকান আর শেষসূর্যের আলো একসঙ্গে মেশা। বিষাদের ভারে আনত। ক্লান্ত এই চেহারার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণপুরীতে দেখা চেহারার কোন মিল নেই।

খানিক আগে বিমান ঘাঁটিতে ব্যস্ততার সীমা ছিল না। চারদিকে জেনারেলদের তদারকি, কমিশনার পুলিশ সুপারের ছোটাছুটি এবং সংবাদ শিকারীদের উৎকণ্ঠা।—নেহরু আসছেন।

সামনে একের পর এক নামছে হেলিকপটার। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় কাতর নেফার অরণ্যে দিশাহারা জখমী জওয়ানদের দল নামছেন। রেডক্রসের গাড়ি আসছে, চলে যাচ্ছে। সেদিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই কারও। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে এবং গলাবন্ধ কোটের ভাঁজ ঠিক করতে করতে অভ্যর্থনাকারীর দল তাকিয়ে আছেন অন্য দিকে, পশ্চিমের আকাশে।—নেহরু আসছেন।

নেহরু নিজে কিন্তু এসেছেন ওই জখমী জওয়ানদের সঙ্গেই দেখা করতে। দেশের প্রতি ধূলিকণা রক্ষা করতে যারা হানাদার চীনেদের ঠেকিয়ে রেখেছেন তাঁদের আরও উৎসাহ জোগাতে।

তেজপুরের সার্কিট হাউসে বসে বারবার জিগগেস করেছেন বুলেট-বেঁধা বুক নিয়ে যে-সব জওয়ান হাসপাতালে, তাঁরা সুস্থ হয়ে উঠেছেন কিনা। তিনি হাসপাতালে গিয়ে যুদ্ধ বন্দীদের বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন। তাঁদের অনেকের চোখে তখন জলের ধারা। একজন বললেন—'পণ্ডিতজী আমার বাবার মত।'

নেহরু হেলিকপটারে চড়ে গেলেন মিসামারি। গেলেন সেনানিবাস চারদুয়ার। সেনাপতিদের সঙ্গে কথা বলে দাঁড়ালেন জওয়ানদের সামনে। বললেন—ভয় নেই, দেশ তোমাদের পেছনে। তোমাদের কষ্ট হয়েছে জানি, কিন্তু নিরাশ হয়ো না। বিশ্রাম নিয়ে আবার তৈয়ার হও। দুষমনের মোকাবিলা করতে হবে।

নেহরুর কথা শুনে জওয়ানরা নড়েচড়ে ওঠেন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে দেখি তাদের চোখে বিদ্যুৎ, হাতের পেশী আরও শক্ত, রাইফেলে সূর্যের ঝিলিক।

কাছেই হিমালয়। তার বুক আজ ক্ষতবিক্ষত। ক্লান্ত উদাস নেহরু তাকালেন ওই দিকে। দাঁড়িয়ে রইলেন নির্নিমেষ।

দাফলা যুবক তিয়াং মিরিং যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। নেহরুকে দেখে মাথা নোয়ালো। নেহরুর মুখে সমবেদনার স্মিত হাসি। যেন বলছেন—'ভয় নেই, আমরা আছি।' এদিকে দাঁড়িয়ে আছে সার বাঁধা জওয়ান, ওদিকে গ্রামের লোক। সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল—'পণ্ডিতজী কী জয়!'

সেই ডাক! দু বছর আগে শ্রীকৃষ্ণপুরীতে শোনা। নেহরু চমকে উঠলেন। আমিও চমকালাম।

কী যেন হারিয়ে গেছে, খুঁজে পাচ্ছেন না। হতচকিত ভাব কাটিয়ে বললেন—'আরে ভাই, জয় হিন্দ বল।'

জনতা চীৎকার দিল—'জয়-হিন্দ।'

পাশে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী চ্যবন। দীর্ঘদেহী ওই মারাঠীর মুখ প্রভাতী সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল।—মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত।

নেহরু আবার উদাস। আবার নির্নিমেষ। তিয়াত্তর বছরের পুরনো মুখে গোধুলির আলো। বুকের রক্তগোলাপ শুকনো। কিন্তু মনে হল মাথার সাদা টুপি সেই মুহূর্তে আরও শুভ্র—ওই হিমালয়ের মত আরও পবিত্র এবং জনতা তখনও চীৎকার দিয়ে বলেছে—'জয় হিন্দ'। বলছে—'পণ্ডিতজী কী জয়!'

আলবের্তো মোরাভিয়া

মোরাভিয়ার সঙ্গে আলাপ নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী অধিবেশনে। বোম্বাইয়ে। ১৯৬১ সালে।

সম্মেলনে নানান দেশ থেকে এসেছেন গুণীজ্ঞানীর দল। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সাহিত্যিকরা তো আছেনই, রুশ জাপান ইংলণ্ড আমেরিকা ফ্রান্স জার্মাণী ইতালী ইরাণ মিশর স্পেন, এমন কি কিউবা চিলি ইথিওপিয়া পর্যন্ত বাদ যায় নি। পুরোপুরি সাহিত্য-মেলা। ১লা জানুয়ারী থেকে ৩রা জানুয়ারী ব্র্যাবোর্ণ স্টেডিয়ামের অধিবেশন-মণ্ডপ ছিল অষ্টপ্রহর জমজমাট।

এ মেলার প্রধান আকর্ষণ ছিলেন আলবের্তো মোরাভিয়া। ইতালীর জনপ্রিয় লেখক। মোরাভিয়া কবে আসছেন কখন আসছেন জানার জন্যে সম্মেলনসচিব সলিল ঘোষকে সবাই জ্বালিয়ে মেরেছেন। সবাই মোরাভিয়ার মুখ থেকে কিছু শোনার জন্যে উৎসুক। অথচ বলতে দ্বিধা নেই, বক্তা হিসেবে সবচেয়ে বেশী হতাশ করেছেন এই মোরাভিয়াই।

সম্মেলনে ভাল ভাল বিদেশী বক্তা এসেছেন অনেক। বৃটিশ কবি রিচার্ড চার্চ, 'স্যাটারডে-রিভ্যুর' সম্পাদক নরম্যান কাজিনস, পেনসিলভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক নর্ম্যান ব্রাউন, মার্টিন ক্যারল, ট্রুম্যান, এলমহার্স্ট প্রভৃতি আরও অনেকে। কিন্তু মোরাভিয়ার দিকে সকলের বেশী নজর পড়ার কারণ বোধ করি এদেশে তাঁর লেখা বইয়ের জনপ্রিয়তা। তিনি চেনা লেখক। ভারতের বাজারে তাঁর বইয়ের কাটতি প্রচুর। মোরাভিয়ার 'উয়্যোম্যান অব রোম' এদেশের যুবক সমাজের মুখে মুখে।

মোরাভিয়া প্রথম দিন আসেন নি। এলেন ২রা জানুয়ারী বিকেলে। সন্ধ্যায় মণ্ডপে বলরাজ সাহানীর দলের হিন্দী 'কাবুলিওলা' অভিনয় হচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ দেখি কালো কোট, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং বাঁকা হাসি নিয়ে প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছেন সামনের আসনের সারিতে। সলিল ঘোষ আলাপ করিয়ে দিলেন—"এই হচ্ছেন মিস্টার মোরাভিয়া।"

পাশে বসে একথা সেকথা। মোরাভিয়া জানালেন, তাঁর নতুন বই 'ব্ল্যাংক ক্যানভাসের' কথা। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞেস করেন নাটকটি কোন ভাষায় অভিনয় হচ্ছে? লেখাই বা কার?

বললাম—"রবীন্দ্রনাথের। অভিনয়ের ভাষা হিন্দী।"

"তাগোরে তাহলে হিন্দীতেই লিখেছেন?" মোরাভিয়া আবার প্রশ্ন করেন।

এবারে আতঙ্কিত হই। রবীন্দ্রনাথ কোন ভাষায় লিখেছেন, তাও জানেন না, অথচ এদিকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে এসেছেন এখানে? মুখে অবশ্যি বললাম—"এটি রবীন্দ্রনাথের এক বাংলা ছোট গল্পের হিন্দী নাট্যরূপ, রবীন্দ্রনাথ বাংলাতেই লিখেছেন।"

মোরাভিয়া আবার প্রশ্ন করেন—"ভারতে তাহলে অনেকগুলি ভাষা?"

"আজ্ঞে।"—আমার জবাব।

"কেন?"—আবার প্রশ্ন।

আমি আর জবাব না দিয়ে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম।

পরদিন সকালে রবীন্দ্র সাহিত্য ব্যাখ্যার অধিবেশনে মোরাভিয়া বক্তৃতা দেবেন। আমার মত অনেকের মনেই এক কথা, 'দেখি মোরাভিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কী বলেন।' কারণ মোরাভিয়ার সঙ্গে আলাপের পর কারও কারও স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে, মোরাভিয়া এবারই প্রথম রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলেন। অনেকের মনে প্রশ্ন

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যদি তাঁর জ্ঞান না থাকে, তবে নেমন্তন্নই বা কেন? আন্তর্জাতিক পি-ই-এন-এর সভাপতি বলেই কি?

মোরাভিয়ার জন্ম ১৯০৭ সালে। রোমে। বাবা ছিলেন স্থপতি। ন' বছর বয়স থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত ভোগেন নানা অসুখে। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যেই শিখে নেন ফরাসী জর্মন ও ইংরেজি। ১৯২৫ সালে মোরাভিয়া যখন তাঁর প্রথম উপন্যাস লেখেন, তখন তিনি তুরিনের দুটি খবরের কাগজের লণ্ডন-সংবাদদাতা। ১৯২৯ সালে তাঁর লেখা বই 'টাইম অব ইনডিফারেন্স' নাম করে। অবশ্যি ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস 'উয়োমেন অব রোম' প্রথম জনপ্রিয়তার রেকর্ড করে। বইটি তিরিশটি ভাষায় অনুদিত হয়েছে, মার্কিন দেশেই বিক্রি হয়েছে এক লাখের বেশী। তাঁর লেখা ১১ খানা বই ইংরেজিতে বেরিয়েছে।

মোরাভিয়া নিজেকে বলেন ক্রিটিক্যাল রিয়্যালিস্ট। আলাপকালে প্রসঙ্গক্রমে জানান ইতালীর আর দশজন লেখকের মত তিনিও বামপন্থী, তবে কম্যুনিস্ট নন।

মুসোলিনীর আমলে মোরাভিয়ার বই বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। তখন তিনি প্রবন্ধ লিখতেন ছদ্মনামে। জর্মন আধিপত্যের সময় তিনি পালিয়ে যান। আত্মগোপন করেন এক পাহাড়ে। দেশে ফেরেন ১৯৪৪ সালের মে মাসে।

মোরাভিয়া ইংরেজী বলেন পরিষ্কার। ধীর স্থির। আলাপী তো বটেই।

রবীন্দ্র সাহিত্য শাখার অধিবেশনে বক্তা অনেক। হিন্দী সাহিত্যের দিকপাল জৈনেন্দ্রকুমার, মারাঠী সাহিত্যিক বোরকার, বাংলাদেশের প্রমথ বিশী, কানাড়ার সীতারামিয়া, অন্ধ্রের ডক্টর সীতাপতি, ওড়িষ্যার কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, গুজরাতের উমাশঙ্কর জোশী, পূর্ব পাকিস্তানের জসীমউদ্দিন তো আছেনই আর আছেন পূর্ব জার্মানীর ডক্টর হাইনৎস মোডে, চেকোশ্লোভাকিয়ার

ডুশান জাভিটেল, মার্কিন দেশের মার্টিন ক্যারল এবং আরও অনেকে।

বক্তার তালিকা দীর্ঘ। বক্তাদের অনেককে নিয়ে আবার সমস্যা। নির্ধারিত সময় বেরিয়ে যায়, বক্তৃতা থামে না, কার্যসূচী বানচাল হয়-হয়, সভাপতি চিট পাঠিয়ে পাঠিয়েও কম্বুকণ্ঠী বক্তাদের নিরস্ত করতে পারেন না। গত চারটি অধিবেশনে এই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

এদিনের অধিবেশনেও যথারীতি বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলছে। একজনের পর একজন আসছেন আর রবীন্দ্রনাথের নানাদিক উদ্ঘাটিত হচ্ছে। মজার ব্যাপার হল, যিনি যে বিষয়ে ওস্তাদ, সে দিকেই রবীন্দ্র প্রতিভাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। ইতালীর এঞ্জেলো মোরেট্টা শঙ্কর-দর্শনের ছাত্র, তিনি শঙ্করাচার্যকে টেনে আনলেন তাঁর রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত বক্তৃতায়। পূর্ব জার্মানীর ডক্টর মোডে প্রাগৈতিহাসিক ভারত সম্পর্কে বাঘা পণ্ডিত। তিনি রবীন্দ্রনাথকে টেনে নিয়ে গেলেন মহেঞ্জোদাড়ো এবং এক শৃঙ্গী ষাঁড়ের চৌহদ্দীতে।

যাই হোক, সবার প্রতীক্ষা মোরাভিয়া কী বলেন। চেকো-শ্লোভাকিয়ার ডুশান জাভিটেল বাংলায় কিছুক্ষণ বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাদের তাক লাগিয়ে দিলেন। হাততালির পর হাততালি। এবারে মোরাভিয়ার বক্তৃতা।

মোরাভিয়া এলেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। দাঁড়ালেন মাইকের সামনে। দুবার কাঁধ নাচালেন, তিনবার কাশলেন তারপর কী যেন বলতে শুরু করলেন।

বক্তৃতার বিষয় কিছুই বোঝা গেল না। শোনা গেল শুধু কয়েকটি শব্দ ডেমোক্রোসি, ইণ্ডাস্ট্রিয়েলাইজেশন, ইউনিটি, তাগোরে ইত্যাদি। ব্যস, বক্তৃতা শেষ। সবাই এর মুখে ওর মুখে তাকান—কী বললেন মোরাভিয়া ?

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলুন আর নাই বলুন মঞ্চ থেকে নামতেই

স্বাক্ষর শিকারীরা তাঁকে ছেঁকে ধরল। এগিয়ে গেলেন দু চারজন উৎসাহী তরুণ। উঠতি সাহিত্যিক কয়েকজনও। সবার দাবি—আলাপ করতে চাই। মোরাভিয়া কাউকে নারাজ করেন না। বলেন, আসুন তাজ হোটেলে, সেখানেই আছি।

বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা মহিলা সাহিত্যিকও ছুটে গেলেন মোরাভিয়ার কাছে। বললেন, "আমি অমুক অব বেঙ্গল। আলোচনা করতে চাই।"

মোরাভিয়া—"আপনি কী ভাষায় লেখেন? হিন্দী না ইংরেজিতে?"

ভদ্রমহিলা—"বললাম যে, আমি অমুক অব বেঙ্গল সুতরাং বাংলাতেই লিখি।"

মোরাভিয়া—"ও, দ্যাটস গুড।"

সাহিত্যালোচনা ওইখানেই শেষ। তবে দুজনের জোড়া ছবি তুললেন বাংলা দেশের আর একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক।

মোরাভিয়া ফিরে গেলেন তাজমহল হোটেলে। সেখানেও অপেক্ষা করছে স্বাক্ষর শিকারীরা। সাহিত্য রসিকরা খুশী না হোক ওরা হয়েছে।

তালকাটোরা বাগ

দিল্লি স্টেশনে গাড়ি পৌঁছল রাত দশটা নাগাদ। আমরা জন তেরো শান্তিনিকেতন থেকে রওয়ানা হয়েছি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে, ছাব্বিশে জানুয়ারী গণতন্ত্র দিবসের সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রায় যোগ দিতে। স্টেশনে পা দিতেই বুঝলাম, ঠাণ্ডা কাকে বলে। মালপত্র বোঝাই করে উঠলাম একখানা খোলা মিলিটারি ট্রাকে। শোনা গেল, আমাদের গন্তব্যস্থল তালকাটোরা বাগ—স্টেশন থেকে মাইল সাতেক। মাঘ মাসের রাত এগারোটায় একখানি খোলা ট্রাক ঘুমন্ত দিল্লির রাস্তা এঁকে বেঁকে যখন বিদ্যুৎবেগে ছুটল ততক্ষণে আমাদের হাত পা অবশ হয়ে গেছে। সাঁইত্রিশ ডিগ্রি তাপমাত্রার ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া যখন তখন বরফ হাতের থাবড়া মেরে চোয়াল ভাঙছে, তুচ্ছ কোট আর সোয়েটারের সাধ্য কী এই ঝাঁক-বাঁধা মেরু-সৈন্যের উদ্দাম রণস্পৃহা থামায়। হাত পা বরফের টুক্‌রো—একটু চাপ দিলেই মুড় মুড় করে ভেঙে পড়বে। আমাদের কারো মুখে 'টু' শব্দটি নেই। গাড়ি চলেছে তো চলেছেই, পথ আর ফুরোয় না। এই তালকাটোরা যে উত্তর মেরুর কাছাকাছি কোন জায়গায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না।

গাড়ি শেষপর্যন্ত থামল একটি তাঁবুর সামনে। ওয়েস্ট বেঙ্গল লেবেল আঁটা বিরাট তাঁবু। ভিতরে সারি সারি খাটিয়া। ট্রাক থেকে কী করে নামলাম, বিছানা পাতলাম, লেপের তলায় ঢুকলাম মনে পড়ে না। কী শীত কী শীত। হাঁটুতে থুতনিতে ঠকাঠক্ কত্তাল বাজিয়ে চিংড়ি মাছের মত কুঁকড়ি মেরে পড়ে আছি। হাতে পায়ে মোজা, লেপে কম্বলে জড়াজড়ি ; তবু তাঁবুর ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডাই

বর্শা সড়াৎ করে ছুটে এসে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেয়। এ কোথায় এলাম রে বাবা? উত্তর মেরু না হোক,—শীতের সিমলে শিলঙ তো বটেই।

সকালবেলা ঘুম ভাঙলো মাইকের 'হ্যালো হ্যালো' চীৎকারে—"দেখিয়ে, স্টেডিআম জানেওয়ালে রিহার্সেল পার্টি তৈয়ার হো যাইয়ে। বাহারমে ট্রাক খাড়ি হ্যায়।" সকাল মানে সাড়ে আটটা। লেপ কম্বলের দুর্গ ছেড়ে সম্মুখ-সমরে লাফিয়ে পড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আবার মাইকেব কলকল নিনাদ—"হ্যালো হ্যালো, দেখিয়ে পেপ্সু আউব মধ্য-প্রদেশকে লাড়াণ আভি রিসেপ্শন রুমমে চলে আইয়ে"—নাঃ, মাইকটা আমাকে আর ঘুমতে দেবে না।

মাইক থেমেছে কি না থেমেছে, হঠাৎ কানে ভেসে আসে মাদলের ধিনাক নাতিন আর নূপুরের ঝমর ঝমর। পাহাড়িয়া মিষ্টি বাঁশীর সুরে গলা মিলিয়ে কারা যেন গানও গাইছে। কী ব্যাপার? চোখ মেলতেই তাঁবুব ফাঁক দিয়ে দেখি বামধনু বঙের শোভাযাত্রা। লাল নীলে বিচিত্র ধরনের পোশাক কখনও সবুজ ওড়না উড়িয়ে, কখনও হলদে পাগড়ি দুলিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। গায়ের গয়না আর পায়ের নূপুরে কেবল ঝমর ঝমর ঠুং ঠাং। এরা কারা? কিছুতেই ঠাওব করতে পারি না।

ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়ার দাপাদাপি অনেকটা কমেছে। সূর্যের আলোর ছিটেফোটাও তেরচা হয়ে তাবুতে গা ঘেঁসে পড়ছে। বাইরে বেরিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড। চারদিকে আনন্দের বসন্তোৎসব। এধারে ওধারে তাবু, তারি ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে বিচিত্র পোশাক, বিচিত্র শিবোভূষণ। জানা অজানা অজস্র ভাষার কলকাকলি। এই তো বেরিয়ে এল তেহরি গাঢ়োয়ালের মেয়েরা,—সবুজ ঘাঘরার উপর লাল ওড়নার আগুন জ্বালিয়ে। নাকের ভারী সোনালী নথে আর গা ভরা গয়নায় সেই আগুনের ঝিলিক। ওপাশে অফুরন্ত স্বাস্থ্যের প্রদর্শনী খুলে আদিম উল্লাসে হেসে চলেছে আদিম

নাগা। হাতে উন্মুক্ত বর্শা, মাথায় রঙীন পালক। রাস্তা দিয়ে ঝমর ঝমর নূপুর বাজিয়ে কলসী মাথায় লাইন বেঁধে চলেছে হায়দবাবাদের বাঞ্জারা মেয়েরা, মুখে খিলখিল হাসি। রঙ-বেরঙের চুমকি বসান রঙীন পোশাকের উপর হাজারো রকমের গয়না সেই হাসির দমকে বুকের আলোড়নে ঝলমল করে বেজে উঠছে। রাস্তার পাশে তীর ধনুক কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকা ভীল ছেলেটা পাগড়িতে পালক গুঁজতে ভুলে যায়।

ডান পাশের ছোট মাঠটায় হিমাচলের চাম্বা জেলার মেয়ের কোমর দুলিয়ে গোল হয়ে নেচে নেচে গান গেয়েই চলেছে—মিষ্টি বাঁশীর সুরে গলা মিলিয়ে। ওদের কাছেই রণপা চড়ে সহজভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী ছেলেরা--হলদে আর লাল রঙের জমকাল পোশাকে। ওই মিষ্টি বাঁশী ছাপিয়ে হঠাৎ বেজে উঠল জয়ঢাক রামশিঙা। পাঞ্জাবের একদল গ্রামবাসী তরোয়াল ঘুরিয়ে এগিয়ে আসছে নাচতে নাচতে। রক্তরাঙা মাথার পাগড়ি প্রতি পদক্ষেপে কেঁপে উঠছে। সুগঠিত স্বাস্থ্য, বাদশাহী গোঁফ। পাগড়ির পালক তরোয়ালের ঘায়ে লাফিয়ে পড়ছে। আমার দু' চোখ গেল ঝলসে। গোটা ভারতবর্ষ তার বিচিত্র বেশভূষা, বিচিত্র সংস্কৃতি নিয়ে আমার চোখের সামনে ছবি হয়ে ধরা গেছে।

এতক্ষণ মনে হচ্ছিল বুঝি বা স্বপ্ন দেখছি। একি কোন ঘুমন্ত রাজকন্যার পাতালপুরীর দেশ নাকি কোন রূপকথার মায়াপুরী? আর আমি কল্পনার মই বেয়ে বুঝি ধাপে ধাপে উঠছি? ছুটে আসা মিলিটারি লোকটির ধাক্কা খেয়ে মনে হল—না ঠিকই আছে। রূপকথা একরত্তি নেই, এ হচ্ছে তালকাটোরা বাগ যেখানে এসেছি কাল রাত্তিরে।

এই তালকাটোরা বাগ নয়াদিল্লির এক প্রান্তে। সামনেই যেমন দেখা যায় রাষ্ট্রপতির বাড়ির চূড়ো তেমনি পেছনে বাবলা বন, ঝোপ ঝাড়, ভাঙা দেয়াল আর খিলানের ধ্বংসাবশেষ। এই বাগেই

লোকনৃত্য আসরে যোগদানকারী সব নাচিয়ের দল আর সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার সবাইকে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। বিড়লা মন্দিরের বড় রাস্তা আর পার্ক স্ট্রীট যেখানে মিশেছে, সেখান থেকে একটি ছোট রাস্তা সোজা চলে গেছে একটি ফটকের দোরগোড়ায়। সামনেই মিলিটারি প্রহরী, কড়া পাহারা। গেট-পাস ছাড়া ভেতরে ঢোকে কার সাধ্যি। ফটকের ভেতরে ঢুকলেই অন্য জগত। এ যে দিল্লি শহর মনেই হবে না। ১৫ই জানুয়ারী থেকে ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত খোলা হয়েছে এই অস্থায়ী আস্তানা। ১লা ফেব্রুয়ারী ভোরবেলা হুকুম হবে—"ডেরা ওঠাও।" পুরো মিলিটারি কনট্রোল। সুন্দর ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে রাস্তা, এক কুচি কাগজ রাস্তায় পড়ার উপায় নেই। প্রবেশপথের ডানদিকে ক্যান্টিন, বাঁদিকে সেলুন, লণ্ড্রী, একটু এগিয়েই রিসেপশন অফিস আর কর্তাদের কর্মব্যস্ততা। এখান থেকেই আসে মাইকের কলকলনাদ। তার পাশেই ডাকঘর, হাসপাতাল, ফায়ার ব্রিগেড। ডান দিকে মোড় ফিরলেই দেখা যাবে সামনেই তৈরি হচ্ছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার গাড়িগুলো। বিরাটাকৃতি এক-একটা ট্রেলারকে এমন নিখুঁতভাবে সাজান হচ্ছে, চমক লাগায়। আর দু' দিন মাত্র বাকি, ফিনিশিং টাচ্ দিতে শিল্পিরা গলদ্‌ঘর্ম। বিহারের বুদ্ধগয়ার মন্দির আর মধ্যভারতে 'থাম বাবা'র মন্দিরের মাঝখানে তৈরি হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ময়ূরপঙ্খী নৌকা, যার নক্সা কলকাতা আর্টস কলেজ থেকে তৈরি করে পাঠান হয়েছিল। মুখ ফিরে তাকাবার ফুরসৎ নেই, এপাশে লাগান হচ্ছে তক্তা; ওপাশে এক-আধটুকু তুলির আঁচড়।

তার উল্টো দিকের ছোট তাঁবুগুলো পার্টি-লীডারদের। গ্রামের লোকেরা বলে 'অব্‌সার বাবু'দের। সংখ্যা গোটা চল্লিশেক। সামনের ছোট পোলটা পেরোলেই এক লাফে পৌঁছান যায় আসামের পার্বত্য উপত্যকায়। আসাম, মণিপুর পাশাপাশি। ওই প্রদেশ থেকেই এসেছে সবচেয়ে বেশি—নাগা, গারো, মিরি

লুসাই, মণিপুরি, ডাফলা, সব জাতের লোক। ওদের প্রত্যেকেরই নিজ হাতে বোনা কি সুন্দর পোশাক! লুসাই মেয়েদের নীল নীল ডোরাকাটা পোশাক সবাইকে টেক্কা মারে। চোখে মুখে শিশুর সারল্য। গ্রাম ছেড়ে এই বোধ হয় প্রথম বিদেশ যাত্রা। মাথায় বিরাট সাদা পাগড়ি বেঁধে একজন বৃদ্ধ মণিপুরি ওস্তাদ তাঁবুর পাশে রোদে গা এলিয়ে খোলের গায়ে বোল তুলছেন—"ধিন তেই ইত তা, খিত তেই ধিন তা।" তালে তালে পা ফেলে ঘাঘরা দুলিয়ে নাচছে দুটি মণিপুরি মেয়ে। ধরাচূড়া পরে, কোমরে চক্চকে ধারাল পাহাড়ী-দা গুঁজে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে ছ' সাত জন ডাফলা সর্দার। ডাফলারা এসেছে আবর পাহাড় থেকে। নাচতে নয়। গণতন্ত্র দিবসে ভারত সরকারের বিশেষ অতিথি হিসেবে। ডাফলাদের নাম শুনেই আমার আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া। মাথা বাঁচিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি। কিছুদিন আগে আচিংমোরির মাঠে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর দুর্গতির কথা এখনও মনে আছে! কে জানে হেড-হাণ্টার্সদের নরমুণ্ডতৃষ্ণা কখন আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। চটপট সরে পড়ার মতলব করতেই দেখি, খোঁচা খোঁচা গোঁফ নিয়ে নাদুস-নুদুস এক ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। আলাপে বোঝা গেল—বাঙালি ভদ্রলোক। নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ারের অফিসার। ডাফলাদের রাজধানীতে নিয়ে এসেছেন তত্ত্বাবধায়ক হয়ে। এই বারো জাতের মেলায় আমার ধুতি পাঞ্জাবি দেখেই ঠিক চিনতে পেরেছেন—

"আর বলবেন না মশায়, কি মুশকিলেই না পড়েছি। বুনোদের সঙ্গে থেকে থেকে পাগল হবার জোগাড়। না পারি ওদের ভাষা বলতে, না পারি বুঝতে। সরকারের কড়া হুকুম—সঙ্গে সঙ্গে থাক। আরে মশায়, দিল্লিতে এসে কি বিপদ! রাস্তায় বেরোলে প্রাণ কাঁপে। না পারে পথে চলতে, না পারে গাড়িতে চড়তে। দোকান-পাটের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই আছে।

একটু কড়া কথা বললেই মুশকিল, যা রগচটা, কখন আবার মুণ্ডুটা বগলদাবা করে কোপ লাগায়। ভয়ে ভয়ে আছি মশায়। আপনাকে দেখে কি বলব মশায়, বড় ভাল লাগল। দেশের লোক হেঁ-হেঁ, —যাব আপনাদের ক্যাম্পে, কি বলেন হেঁ-হেঁ"—

আমি সম্মতির সঙ্গে নমস্কার জানিয়ে দ্রুত পা বাড়াই। এক্ষুনি যদি ওদের রগ চটে যায়। ডানদিকে লম্বা লম্বা তিন চারটে তাঁবুর লাইন। উড়িষ্যা, বিহার, আজমীড়, মধ্যভারত, সৌরাষ্ট্র, হিমাচল, রাজস্থান আরও অনেক প্রদেশ। এক পাশে লাইন-বাঁধা জলের কল। কলের পাশে মেয়েদের কিচির মিচির, কেউ কাপড় কাচছে, কেউ ঘটিতে জল ভরে নিচ্ছে, কেউ আবার গোল হয়ে সুখ-দুঃখের কথা বলতে শুরু করেছে। এক বুড়ি ধমকাচ্ছে মেয়েদের—"জলদি কর, জলদি কর, 'রিহার্সিল' শুরু হবে; 'ইস্টিডাম' যেতে হবে।" হিমাচলের দুটি দল —এক দলে কেবল ছেলেরা, লাল রঙের পোশাক, গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত। পাগড়ির সঙ্গে বাঁধা রূপালী ঝালর, মুখের ডানদিক জুড়ে। অন্য দলে চাম্বার মেয়ে আর ছেলেরা। পাহাড়ি পোশাক, অনেকটা তেহরি গাড়োয়ালের মত। ওদের কাছাকাছি বোম্বাই। প্রতিনিধিত্ব করছে একদল গোয়ানীজ। মেয়েদের গালে রুজ, ঠোঁটে লিপস্টিক, পায়ে হাইহীল জুতো। তাঁবুর ভেতরে হার্মোনাইজড্ বিলিতি গান; সঙ্গে সঙ্গে বাজছে গীটার, ব্যাঞ্জো। তালকাটোরার সুরের সঙ্গে এ সুর একদম মিলছে না। না গানে, না নাচে, না চালচলনে।

ক্যান্টিনের পাশ থেকে আরও সারি সারি লাইন। উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, পেপসু, মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ। পেপসুদের উদ্দামতা সবচেয়ে বেশি—নাগাদের টেক্কা দিয়ে। চকচকে দাড়ি আর ইয়া গোঁফ চাড়া দিয়ে, মাথায় লাল নীল ফেট্টি বেঁধে, সাদা কাজ-করা পাঞ্জাবির উপর রঙীন ফতুয়া লাগিয়ে উদ্দাম নেচে চলেছে অষ্ট প্রহর। ওদের বাজনা অনেকটা আমাদের দুর্গাপূজার ঢাকীর বাজনার

মত। সোজা তাল, ঐ তালে ঘাড় বেঁকিয়ে হেলে তুলে অবিশ্রান্ত নেচেই চলেছে। ওদের নাচের নাম ভাঙরা নাচ! খুব প্রাচীন। নাচ শুরু হওয়ার আগে দলের একজন চেঁচিয়ে বলে দেয়, কোন্ গল্পকে রূপায়িত করছে নাচের মধ্যে। প্রথমে নাচের লয় বিলম্বিত, তারপর আস্তে আস্তে লয় যত বাড়ে, ততই নাচিয়েরা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি সহকারে উদ্দাম হয়ে ওঠে।

সামনেই একটি ছোট মাঠ। সেই মাঠে মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী ছেলেরা জমকালো পোশাক পরে, মাথায় পালক গুঁজে, রণ-পা চড়ে নাচছে। যেমন ব্যালান্স, তেমন স্কিল। একপাশে রিহার্সেল রুম। ভেতরে চলছে সেরাইকেল্লার ছৌ নাচ;—সাপের মত সাবলীল গতিতে সারাটা শরীর এঁকে বেঁকে যাচ্ছে। ওপাশেই উত্তর প্রদেশের তাঁবু। তাঁবুর ভিতর কয়েকজন, এই শীতে স্রেফ ফতুয়া গায়ে তাস খেলে যাচ্ছে। বোধ হয়, রিহার্সেল থেকে ফিরল। চারজন তাস খেলছে তো আটাশজন হুমড়ি খেয়ে খেলা দেখছে। তাঁবুর সামনে একটি মাঝবয়সী লোক একমনে বিড়ি ফুঁকছে। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ভাব দেখে মনে হয়, বুঝিবা নিজের গ্রামে বারান্দার চার-পাইয়ের উপর বসে আছে।

ছোট মাঠের পাশেই গায়ে-লাগা তুটি ক্যাম্প পশ্চিমবঙ্গ আর মধ্যপ্রদেশ—মধ্যপ্রদেশের অনেকগুলো ক্যাম্প আমাদের পাশেরটাতে আছে। নাগপুরের মেয়েরা আমাদের মতই 'ট্যাবলো' পার্টি। আমাদের যেমন বৌদ্ধ ভিক্ষু আর মাঝি সেজে সঙ্ঘমিত্রার সিংহল-যাত্রার মূকাভিনয় করতে হবে, তেমনি ওঁরাও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মেয়ে সাজবেন। আমাদের এই তুটি দল এই জমকালো রঙ-বেরঙের মধ্যে একটু যেন দলছাড়া।

আমাদেরও অনেকে ভেবেছিল, বাংলা দেশের 'ফোক' ডান্সার। ক্যামেরাম্যানরা জিগ্যেস করত আমাদের নাচ কখন শুরু হবে। ছবি তুলতে চায়। আমরা নাচিয়ে নই জেনে অন্য তঁবুতে ঢোকে।

ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রদেশ থেকে লোকনৃত্যের প্রতিনিধিত্ব হয়েছে। বাংলা দেশের অনুপস্থিতি কেন? বাংলা দেশের রায়বেঁশে, বাউল, গাজন, গম্ভীরা কি দর্শনযোগ্য নয়? পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন যে কোন দল পাঠালেন না, বোঝা গেল না। তেমনি সাঁওতাল নাচেরও ব্যবস্থা হয় নি। বাংলা বা বিহার যে-কোন সরকারই পাঠাতে পারতেন। আরেকটি জিনিস লক্ষ্যণীয়। নাচিয়ে যারা এসেছে, তারা সবাই উত্তর ভারতের। দাক্ষিণাত্যের কোন প্রতিনিধিত্বই হয় নি। লোকনৃত্যের আসরে দাক্ষিণাত্যের নির্লিপ্ততার কারণ কি?

পশ্চিম দিককার ভাঙা দেয়ালের ধার ঘেঁষে রান্নাঘর আর ডাইনিং হল। চারবেলা খাবারের ব্যবস্থা বিরাট বিরাট ডাইনিং তাঁবুতে। দুটি আমিষ, দুটি নিরামিষ। রান্নাবান্নার ভারও মিলিটারির হাতে। ভাত, রুটি দুই-ই মেলে। দুবেলা মাংস কখনো মাছ। দুপুরে ফল আর রাত্তিরে হালুয়া, তাছাড়া ডাল-তরকারি তো আছেই। আমাদের প্রত্যেকের কাছে একখানি করে ফুড রেশন কার্ড। মাইকে-চিৎকার করে বলা হল—'দেখিয়ে, দুপ্পর কা খানা তৈয়ার হ্যায়।' মাইক বলেছে কি না বলেছে—গিয়ে দেখা যাবে লম্বা কিউ। সামনের টেবিলে সারি সারি থালা,—তার উপর ফুলের পাপড়ির মত অনেক-গুলি বাটি সাজানো। বাইরে খোলা জায়গায় রুটি, ভাত, তরকারি, মাংস, সব আলাদা আলাদা। ফুডবাবুকে কার্ড দেখিয়ে একটি একটি করে খাবার তুলে নিতে হয় থালা-বাটিতে। তারপর সোজা হলঘরে। একেই বলে কমিউনিটি কিচেন। চারবেলা সাত-আটশো লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা। লম্বা একফালি রাস্তার দুপাশে চেয়ার-ঘেরা ত্রিশ-চল্লিশটা টেবিল। সব দেশের সব জাতের লোক গো-গ্রাসে গিলছে।

'এই দেখো, আউর দো ফুলকো লাও।'

'হেই পানি, জলদি ইধার আও।'

'চাউল সব্জী,' 'চাউল সব্জী!'

'নহী নহী, থোড়া গোস্ত লাও।'

একদল উঠে যাচ্ছে, আরেকদল বসছে। যার যা প্রয়োজন, রান্নাঘরের লোকেরা দিয়ে যাচ্ছে। গল্পগুজব, হাঁকডাকে মুখর। প্রথম প্রথম ওদের রান্না খেতেই পারতাম না, তারপর সহ্য হয়ে গিয়েছিল। আমাদের একটি বন্ধু তো মাংস-রুটি খেয়ে খেয়ে ওজন বাড়িয়েই ফেলেছে। মাঝে মাঝে রাত্তিরে মাছ দিত, সেদিন আমাদের খুব ফুর্তি। রান্নাঘরের লোকেরা আমাদের বাঙালি বলে চিনতে পেরেছিল, সেদিন ওরা অকৃপণ ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে বলত —'লেও বংগালি বাবু, আউর দো মছলি লেও।'

আমার একপাশে বসেছে একটি হিমাচল প্রদেশের লোক। রুটি আর মাংস এন্তার খেয়ে যাচ্ছে। ওকে জিগ্‌গেস করলাম— দিল্লী কি রকম লাগছে? একগাল হেসে 'বহুত আচ্ছা' বলেই হাঁক দেয়—গোস্ত, গোস্ত লাও।' কথা বলার তর সয় না। প্রত্যেকটি লোকই দেখলাম মনের আনন্দে খেয়ে যাচ্ছে। সামনের চেয়ারেই সৌরাষ্ট্রের একটি লোক, তুজন নাগা। নাগা আর সৌরাষ্ট্রের লোকটির মাঝখানে বসেছেন ধোপত্বরস্ত জামা-কাপড়-পরা একজন ভদ্রলোক। পাশের লোকদের গায়ের গন্ধে ভদ্রলোকের খাওয়া হচ্ছে না, বার বার নাক সিঁটকাচ্ছেন।

'কি হল, খাচ্ছেন না যে?'

'খাই কি করে বলুন—যা গন্ধ—বাপরে! অন্নপ্রাশনের ভাত বেরিয়ে আসার জোগাড়। গভর্ণমেণ্টের অন্যায়। এই ছোটলোকদের সঙ্গে না দিয়ে আমাদের একটু আলাদা ব্যবস্থা করলেই হত।'

আমি একটু আপত্তি করতেই ভদ্রলোক খেঁকিয়ে ওঠেন—কি বলছেন মশাই? একে বলছেন—বেশ?···এঁহে-হেঁ-হেঁ নাগাটা আবার দিলে জল ঢেলে·—না আর খাওয়া হল না,—ওয়াক থু— ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে যান।

আমার তো মনে হয় এই কিচেনটা অতি চমৎকার। আমাদের ভারতবর্ষের এত বিভেদ, এত বৈষম্য, এই ভেদ দূর হয় সবাই এক টেবিলে খেতে বসলে। খাওয়ার সময় মানুষের ঔদার্যগুণ অনেক বেড়ে যায়—ধরা পড়ে সহজ আত্মীয়তার সুর। তালকাটোরার এই ভোজনতীর্থে দেখা গেল, আমরা, ভারতবাসীরা সব সমান—সব এক। প্রদেশ নেই, ধর্ম নেই, ছোট—বড় নেই। আদর্শ ব্যবস্থা।

আমাদের ডেলি রুটিন একেবারে গৎ-বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। আমরা এসেছি তেইশে জানুয়ারী রাত্তিরে। চব্বিশ পঁচিশ দু'দিন হাতে। ছাব্বিশে সকালেই যা কিছু কাজ। ন'টা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়েই বেরিয়ে পড়তাম। সকাল বিকেল তাঁবুতে তাঁবুতে চক্কর। কখনো-সখনো বাইরে বেরোতাম। একবার যদি ট্যাবলো গাড়ির পাশে যাই তো আরেকবার নাগাদের ক্যাম্পে। সৌরাষ্ট্রের নাচ দেখতে দেখতে ছুটি রাজস্থানের গান শুনতে। আগে নাচগানের রিহার্সেল হত এখানকার রিহার্সেল রুমে। চব্বিশে থেকে সকাল বিকেল পালা করে স্টেডিয়ামে হচ্ছে। সেখানেই সাতাশ ও আটাশ তারিখে আসর বসবে। ট্রাকে চড়ে একদল আসছে তো আরেক দল যাচ্ছে। দিন রাত প্রেস ফটোগ্রাফার, রিপোর্টার, ক্যামেরাম্যানের ভীড়। ক্লিক্ ক্লিক্ ক্লিক্। আর আসতেন ফিল্ম ডিভিসনের মিঃ ভবনানী পুরো দলবল নিয়ে। পাশের উঁচু পাহাড়টায় ভাঙা খিলানের ধারে সকালবেলা শুটিং চলত, ক্যামেরাম্যান ছাড়া গাড়ি হাঁকিয়ে ক্যামেরা ঝুলিয়ে চোখে মুখে এক গাদা কৌতূহল নিয়ে আসতেন অনেক গাব্দা-গোব্দা সাহেব মেম। ফরেন এমবেসীর লোক। দিল্লীর ভারতবর্ষে তাল-কাটোরার ভারতবর্ষে কত তফাৎ। কখনো-সখনো আসতেন নৃত্য-শিক্ষার্থীর দল বিভিন্ন লোকনৃত্যের স্টেপিং শিখে নিতে। গ্রামের মেয়েরা তো হেসে কুটিকুটি। এতে শেখার কি আছে। কত সহজ, "এক দো' তিন চার, এক দো' তিন চার।" এই সহজ

নাচ শিখতেই যখন শিক্ষার্থীরা হোঁচট খান তখন তারা আশ্চর্য হয়ে যায়।

গণ্যমান্য অতিথিরা আসতেন প্রত্যেক দিন। একদিন এসেছেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে সবার খোঁজ নিয়ে গেছেন। জওহরলাল এসেছেন ত্রিশে, লোকনৃত্যের পুরস্কার দিতে। প্রথম পুরস্কার পেল হিমালয়ের চাম্বার নাচিয়েরা। ওরা থাকত আমাদের তাঁবুর ঠিক সামনে। ওরা এসেছে চুরাহা বলে একটি দুর্গম পার্বত্য জায়গা থেকে। মেয়েরা নথ দুলিয়ে গোল হয়ে নাচে আর গান গায়। ছেলেরা দাঁড়িয়ে ধুয়া ধরে। সঙ্গে বাজে সানাই আর ঢোল। টানা টানা সুর, অনেকটা আমাদের সাঁওতালদের মত। ওদের ভাষা বুঝি না, কানে অস্পষ্টভাবে কিছুটা আভাস আসে।

"জিয়া রেবা বাঙ্গাডোবা ও—ই—য়ে।
হুয়াস ফেরা উখলাটিয়া মা—না—হে।
ধিনতা নিতাং, ধাই ধাই, ধিনতা নিতাং—

আসামের মণিপুরী নাচ ছাড়া আরো অনেক সুন্দর নাচ ছিল। লুসাই মেয়েদের বাঁশ-নাচ অপূর্ব। দুধারে মেয়েরা বাঁশের কোনা ধরে বসে থাকে, গানের তালে তালে কখনো তোলে, কখনো নামায়, কখনো জোড়া লাগায়। তারি ফাঁক দিয়ে তিনচারজন নেচে নেচে ঘুরে বেড়ায়। কি কঠিন ব্যাপার, একটু ভুল হলেই পা হড়কে পড়বে ; নয়তো চ্যাপ্টা হয়ে যাবে বাঁশের চাপে। মিরিরা নেচেছে হুশারি নাচ, ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে মিলে। গারো আর নাগা নাচও চমৎকার। নাগারা দুটো নাচের দল নিয়ে এসেছে। একটির নাম মাখোম লাম নাচ। আনন্দের নাচ। ভগবান সৃষ্টির আনন্দে প্রকৃতির সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্যে উন্মত্ত। অন্যটির নাম "পুমসম কাডিমলাম". পেছনে বাজে ড্রাম—ধুমধাম ড্রিম ড্রিম, একজন চেঁচিয়ে

গান গায় আর সারি বেঁধে একদল যোধৃবেশে নৃত্য করে। উন্মুক্ত বর্শা রঙীন পোশাকের ঔজ্জ্বল্যে চিকমিক করে ওঠে।

হায়দরাবাদের বাঞ্জারা মেয়েরা চুমকি বসানো ঘাঘরা দুলিয়ে নেচে চলেছে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, বাড়ি ফেরার সময় হল। একজন কুয়ো থেকে তুলছে জল আর ত্রিশ চল্লিশজন পেতলের কলসী মাথায় গোল হয়ে নাচতে নাচতে গান ধরেছে। ঘরে ফেরার গান। সঙ্গে বাজছে ঢাক ঢোল কাঁসি—

ধেই কুড় কুড় ধাই ধাই
ধিতাং টেং ধিতাং টেং
জলদি চল সাঁঝ হল রে।
জল ভরে নে জল ভরে নে।
শাশুড়ি তোর ধমক্ দেবে।
জল ভরে নে, জল ভরে নে,
ধিতাং টেং ধিতাং টেং।

এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা যায় না। এই কোণে একটু বসি তো ওখানকার বাঁশী ডাকে। বাঁশী ডাকে তো খোলের বোল মন মাতায়। পাগল হবার জোগাড়।

মণিপুরী লাইহারাওবা নাচ দেখতে দেখতে পড়েছি ভীলদের মাঝখানে। ভীলরা এসেছে মধ্যভারত থেকে। তীর ধনুক হাতে ওরা নাচছে কখনও 'বাবুরিয়া' কখনও 'লাডালাডি'। 'বাবুরিয়া' ফসল কাটার নাচ, উৎসবের নাচ। 'লাডালাডি' বিয়ের নাচ। বরকনেকে তোলা হয়েছে কাঁধে, বিরাট বিরাট ড্রাম বাজিয়ে তাকে ঘিরে নাচ চলেছে।

দুপুর বেলা একটা থেকে তিনটে সবাই জিরোয় তাঁবুতে। তখন কেউ তাস পেটায় কেউ যায় শহর দেখতে—গাড়ি-ঘোড়া, দোকানপাট কত জিনিস। বিকেলের দিকে আবার নাচগান। ক্যাম্প থেকে বেরোনো দায়। চুম্বকের মত টানে। সৌরাষ্ট্রের

তাঁবুর কাছে দেখি ওরা নাচছে টিপ্পনী নৃত্য। আমি নাম দিয়েছি 'দুরমুশ নাচ'। গেরুয়া রঙের শাড়ি পরে মজুর শ্রেণীর মেয়েরা এই নাচ নাচে। খানিকটা আমাদের ছাদপেটা গানের মত ঢঙ। গানের তালে তালে বিভিন্ন ভঙ্গীতে হাতের লম্বা মুগুর ফেলে। রাস্তা সমান করার নাচ। ওরা এসেছে জুনাগড়ের কাছাকাছি চোরাবাদ বলে একটি জায়গা থেকে। ইতিমধ্যে এখানকার রিহার্সেল রুম থেকে ভেসে আসে গানের সুর, নূপুরের গুঞ্জন। উত্তর প্রদেশের ভুটিয়া মেয়েরা নাচছে 'রাঙ্গভাঙ্গ' নাচ। ওরা এসেছে তেহরি গাড়োয়াল, আলমোড়া থেকে। সামনে মেয়েরা পেছনে ছেলেরা পাশাপাশি হাত ধরে ঝুঁকে ঝুঁকে নাচ আর গান।

ছাব্বিশে জানুয়ারী শেষ রাত্তির থেকে আমাদের তাঁবুতে হৈ হৈ। আটটার মধ্যে সবার তৈরি হওয়া চাই। সাড়ে ন'টা থেকে শুরু হবে শোভাযাত্রা। 'ট্যাবলো-গাড়ি'গুলো পঁচিশে সন্ধ্যেবেলা তাঁবু থেকে সরিয়ে সেক্রেটারিয়েটের কাছাকাছি রাখা হয়েছে। ওইখানে গিয়ে উঠতে হবে। তারপর একদম মিলিটারি হেপাজত। ড্রেসের বাক্স খোলা হল, রঙ গোলা হল। ধুতি কাপড় ছাড়। রঙ লাগাও। সঙ্ঘমিত্রার ভুরু আঁক। ভিক্ষুদের গোঁফ ছাঁট। নিদারুণ কর্মব্যস্ততা। আটটার মধ্যেই তাঁবু থেকে বেরোল সঙ্ঘ-মিত্রা, তাঁর সখী, চারজন বৌদ্ধভিক্ষু, চারজন মাঝি। কাউকে যে চেনাই যায় না। কাষায় বস্ত্র জড়িয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে গম্ভীর মুখ করে উনি কে দাঁড়িয়ে? আরে, এ যে আমাদের সুধীর চন্দ্র! আর লম্বা জুলফি, ইয়া গোঁফ, ঝাঁকড়াচুল আর কর্ণকুণ্ডল পরে টগবগ করে তাকাচ্ছেন উনি কে? কি আশ্চর্য! এ যে আমাদের শোভা ব্রহ্ম, বর্তমানে শোভাং মাঝি। এতক্ষণে মনে হল এই জমকালো রঙের আসরে আমরাও কেউকেটা নই। বরকনের বিদায় দেবার মত আমাদের দলবলকে আস্তে আস্তে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি। সামনেই যাচ্ছিলেন কয়েকজন খাঁটি বৌদ্ধভিক্ষু—

বিহারের প্রতিনিধিত্ব করে। এই ভেজাল ভিক্ষুদের দেখে ওঁরা থ'! এরা এল কোত্থেকে?

অসম্ভব ভীড়! দিল্লীর লোক কাতারে কাতারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কিংসওয়ের দুধারে। মিলিটারি অফিসার আমাদের টেনে নিয়ে না গেলে ভেতরে যাওয়াই হত না। বসানো হল গেস্ট কর্নারের সামনের সারিতে—একেবারে রাষ্ট্রপতির আসনের সামনা সামনি। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টায় রাষ্ট্রপতির স্টেট কোচ, টগবগ টগবগ ঘোড়া হাঁকিয়ে পতাকার তলায় দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে দুমদাম তোপের আওয়াজ। এ ধারে ইণ্ডিয়া গেট ওধারে সাউথ ব্লক, নর্থ ব্লক, রাষ্ট্রপতি ভবনের চূড়ো—কাতারে কাতারে লোক, আকাশে উড়ছে তেরঙা পতাকা, অদ্ভুত গম্ভীর পরিবেশ। রাষ্ট্রপতি দাঁড়াতেই মিলিটারি ব্যাণ্ডে 'জনগণমন'—আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। ভূটানের মহারাজাকে প্রথম 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি আর দু'একটি উপাধি বিতরণের পর শুরু হল মিলিটারি প্যারেড। এক এক করে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র, পদাতিক বাহিনী, নাবিক দল, বৈমানিক দল, অশ্বারোহী, উষ্ট্রারোহী সৈন্য, জাঠ বাহিনী, গোয়ালিয়র বাহিনী, গোর্খা বাহিনী। ব্যাণ্ডের তালে তালে বুক উঁচিয়ে কদম কদম এগিয়ে চলেছে। বিদ্যুৎ বেগে ছুটে আসছে এরোপ্লেন। রাষ্ট্রপতি একে একে অভিবাদন নিচ্ছেন। প্রতিটি দর্শকের মনের অবস্থা প্রকাশের বাইরে। বার বার ঘুরে ঘুরে এই কথা মনে হয় যে, এই জাতীয় সঙ্গীত, এই পতাকা, এই নওজোয়ানের দল—এরা আমাদের দেশের, আমাদের রাষ্ট্রের। খবরের কাগজে হেড লাইন পড়ে এর কোন আন্দাজ করা সম্ভব নয়। গণতন্ত্র দিবসের এই প্যারেড প্রত্যেকের মনে স্থায়ী ছাপ রেখে যায়।

মিলিটারি প্যারেডের পর লোকনৃত্যের দল নাচতে নাচতে রাষ্ট্রপতির সম্মুখ দিয়ে চলে গেল। সর্বশেষে সাংস্কৃতিক শোভা-

যাত্রা। প্রথমে এল জমকালো সাজানো দুটি বিরাট হাতি। হাতির উপর বাজছে সানাই—উৎসবের সুর। 'ট্যাবলো গাড়ি'-গুলোকে খুব আস্তে আস্তে টেনে আনছে এক একটি ট্রাকটার। প্রথমেই বিহারের বুদ্ধগয়ার মন্দিরের চূড়ো দেখা গেল। বোধি-দ্রুমের তলায় মন্দিরের পাশে বসে আছেন বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল। উচ্চারণ করছেন—"ওঁ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধর্মং শরণং গচ্ছামি। সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।" তারপরেই মধ্যভারত। উঁচু গরুড় স্তম্ভের উপর বসানো বিষ্ণুমূর্তি। সেখানকার লোকেরা বলে 'থাম বাবা'। সামনেই বসে আছেন ভক্ত পূজারীরদল। কয়েকজন গ্রীক রাজ-পুরুষও রয়েছেন। বিদিশার রাজা ভগভদ্রের সভায় হেলিওদোরোস নামে একজন গ্রীক অমাত্য এসেছিলেন তক্ষশীলার গ্রীক রাজা আন্টিয়াল্সিডাসের দূত হিসেবে। হেলিওদোরোস পরে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে নিজের নাম রাখেন ভগবত। তিনিই তৈরি করেন এই গরুড়স্তম্ভ ও বিষ্ণুমূর্তি।

মধ্যভারত পেরিয়ে যেতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ। মাঝিদের দাঁড়ের টানে পাল তুলে এগিয়ে আসছে ময়ূরপঙ্খী নৌকো মন্থর গতিতে। অশোক-কন্যা সঙ্ঘমিত্রা বোধিবৃক্ষের চারা হাতে দণ্ডায়-মানা, পার্শ্বে উপবিষ্টা ব্যজনচারিণী সখী। পশ্চাতের ভিক্ষুর হাতে রাজছত্র, পার্শ্বে ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষুর দল। মুখে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' মন্ত্র। আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা ছবি হয়ে ধরা দিল। সাঁচি স্তূপে আর অজন্তার গুহায় সঙ্ঘমিত্রার সিংহল যাত্রার যে ছবি পাওয়া যায় তারই অবিকল প্রতিরূপ এই ময়ূরপঙ্খী নৌকা—সুন্দর চিত্রণে ও পরি-কল্পনায় অভিনব। বাংলা দেশের তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে যাত্রা করেছিলেন রাজকুমারী সঙ্ঘমিত্রা। কথিত আছে প্রিয়দর্শী রাজা অশোক বন্দর পর্যন্ত এসেছিলেন রাজকুমারীকে তুলে দিতে—

দুই হাতে আশীর্বাদ করেছিলেন নিরাপদ যাত্রার মধ্য দিয়ে মহান বুদ্ধের বাণী যেন সুদূর সিংহলে পৌঁছয়।

তারপর একে একে পেরিয়ে গেল উত্তর প্রদেশ—কুম্ভমেলায় হর্ষবর্ধন, রাজ্যশ্রীর ঐশ্বর্য বিতরণ—রাজস্থানের মীরাবাঈয়ের মন্দির, পাঞ্জাবের সীমান্ত-গ্রামের দৃশ্য, আসামের বস্ত্র-বয়ন, মহারাষ্ট্রীয় বিবাহ, বাহাদুর শাহের মুশায়েরা, ত্রিবাঙ্কুরের তিল্লুল নাটক অভিনয়—আরো কত কি। সবাক চলচ্চিত্রের মত গোটা ভারতবর্ষে তার বৈচিত্র্য নিয়ে আমাদের চোখের সামনে স্বপ্নের মত বেরিয়ে গেল। এই শোভাযাত্রায় লোকনৃত্যের মত দাক্ষিণাত্যের অনুপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। কেবল ত্রিবাঙ্কুরের 'তিল্লুল' অভিনয়—তাও দিল্লির স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা।

এই অনুষ্ঠান চলেছে পুরো দু'ঘণ্টা, অনেক কষ্টে ভীড় ঠেলে তাঁবুতে ফিরেছি। লালকেল্লা থেকে পরিশ্রান্ত সঙ্ঘমিত্রার দলের ফিরতে ফিরতে আড়াইটা বেজে গিয়েছিল।

সাতাশ ও আটাশ তারিখ সন্ধ্যায় ন্যাশনেল স্টেডিয়ামে লোক-নৃত্যের আসর। আমাদের দলের শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ অন্যতম বিচারক। ট্যাবলো পার্টির লোক ও সরকারের অতিথি হিসাবে বিনা টিকিটে আমাদের ভিতরে যাবার সুযোগ হল। স্টেডিয়াম লোকে লোকারণ্য। মধ্যিখানে উঁচু বেদি করে নাচের জায়গা হয়েছে। গানের জন্যে মাইক। আলোর প্রাচুর্য থাকায় দূর থেকে দেখার কোন অসুবিধে হয় নি। আসর শুরু হয় মণিপুরী নাচ দিয়ে। শেষও মণিপুরীতে। প্রত্যেক প্রদেশের সময় ভাগ করা ছিল। কারো পাঁচ, কারো সাত মিনিট। একদল আসছে আরেক দল যাচ্ছে। মাঝখানে কেবল বিজলি বাতির 'অফ', 'অন'। এত-দিন ধরে দিনরাতই এই সব নাচের মহড়া দেখেছি তাই সব জানা হয়ে গিয়েছে, নতুন করে উপভোগ করার কিছুই নেই। প্রত্যেকটি নাচই অপূর্ব। তবে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে মধ্যপ্রদেশের

রণ-পা নাচ, সৌরাষ্ট্রের টিপ্পনি নাচ, নাগা লুসাই নাচ, সেরাইকেল্লার ছো, আর চাম্বার নাচ। এই চাম্বারই প্রথম পুরস্কার পেল শেষ পর্যন্ত। শুনেছি অনেকগুলো দলের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়েছিল।

আটাশ তারিখ সন্ধ্যেবেলা মাইকে জানিয়ে দেওয়া হল উনত্রিশে অপরাহ্ণে আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন—প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর বাড়িতে। প্রধান মন্ত্রীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ লাভের সৌভাগ্যে আমরা আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। নেহরুকে আগে অনেকবার দেখেছি—কলকাতার জনসভায় বক্তৃতা দিতে, শান্তিনিকেতন আম্রকুঞ্জে সমাবর্তন ভাষণ দিতে। কিন্তু একেবারে কাছাকাছি পাবার সুযোগ এইবার প্রথম। আমাদের দলের সবাই ধুতি পাঞ্জাবি পরে আর গলায় চাদরটি ঝুলিয়ে খাঁটি বাঙালী সেজে যখন প্রধান মন্ত্রীর বাড়িতে পৌঁছলাম তখন সাড়ে তিনটা। পেছনদিককার লনে গিয়ে দেখি হৈ হৈ কাণ্ড। পুরো তালকাটোরা বাগ এই লনে উঠে এসে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে। সবুজ ঘাসের উপর রামধনু-ঝিলিক। লনে নামতেই পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা। অভ্যাগতদের দু'হাত তুলে নমস্কার জানাচ্ছেন স্মিতহাস্যে। প্রাণের প্রাচুর্যে উচ্ছল। সপ্রতিভ প্রতিটি পদক্ষেপ। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই তাঁকে "ঋতুরাজ বসন্তের" সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। চোখে মুখে একটুও ক্লান্তির ছাপ নেই, দেখে মনে হয় না, দুদিন আগেই ফিরেছেন কল্যাণী থেকে বিভিন্ন সমস্যার গুরুতর আলোচনা করে। পণ্ডিতজীকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, একবার ডাকে পেপসু, আরেকবার হিমাচল। তিনি সবার ডাকে সাড়া দেন। ছবি তোলেন। একটু পরেই এলেন আমাদের কাছে। দু'হাত তুলে নমস্কার জানালেন। জিগগেস করলেন চা খাওয়া হয়েছে কি না। পণ্ডিতজী আমাদের কাছে এলেন একসঙ্গে চা খেতে। প্রচুর খাবার, মিষ্টি নোনতা। ইতিমধ্যে একদল ছেলেমেয়ে খাতা বাগিয়ে ধরেছে অটোগ্রাফ চাই। পণ্ডিতজী যতই বলেন—

"নো, নো, মাইডিয়ার নো" ততই ওরা বলে "প্লীজ, প্লীজ"। শেষ পর্যন্ত খসখস কলম চালাতে হয়। মধ্যপ্রদেশের লোকেরা ওঁকে ঘিরে ধরেছে। ওদের সঙ্গে ছবি তোলা হয় নি। অসমাপ্ত চায়ের কাপ ফেলে আবার ছোটেন ছবি তুলতে। একজন গ্রামবাসীর মাথা থেকে লাল পাগড়ি খুলে পরেন নিজের মাথায় আর নিজের সাদা টুপীটা ওর মাথায় দিয়ে বলেন, 'তুম ইয়ে লেও।" এখানে নাচ, ওখানে গান। পণ্ডিতজী ঘুরে বেড়ান। হঠাৎ পেপসুর লোকেরা ওঁকে ঘিবে দাঁড়ায়, ওঁর নামে গান বানিয়ে গোল হয়ে নাচতে থাকে। আমাদের সঙ্গে মিনিট চল্লিশ থেকে হাত তুলে বিদায় চাইলেন। একটু পরেই জরুরী কাজ, গোপন বৈঠক। যাবার আগে কন্যা ইন্দিরাকে বলে গেলেন অতিথিদের আপ্যায়িত করতে—এক দুই জন অতিথি নয়, হাজারের কাছাকাছি। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তার নেতার বাড়িতে। অফিস ঘরে, বৈঠকখানায় ঘুরে বেড়াচ্ছে নিজের বাড়ির মত। ঘুরে ঘুরে ছবি দেখছি—বাপুজী, মতিলাল, সুভাস, নগীব, চৌ এন লাই, ট্রুম্যান—দেখছি বিভিন্ন শিল্প সংগ্রহ। পণ্ডিতজীর বাড়ি থেকে বেরোলাম একটা পূর্ণ পরিতৃপ্তির আস্পদ নিয়ে। মনে হল যেন কোন নিকট আত্মীয়ের বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরছি।

তাঁবুতে ফিরেই শুনি একত্রিশে তারিখে রাষ্ট্রপতি ভবনে আমাদের আরেকটি নেমন্তন্ন। কিন্তু সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হল না। কারণ ত্রিশে ভোরবেলাতেই আমাদের এখানকার পালা সাঙ্গ। ত্রিশে সকালে শান্তিনিকেতন থেকে আরেকটি দল আসছে 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'তাসের দেশ' অভিনয় করতে। স্বল্পমূল্যে গৃহ নির্মাণের যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী মথুরা রোডে খোলা হয়েছে সেখানে, ৩০শে, ৩১শে 'তাসের দেশ' এবং ১লা, ২রা 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয় হবে ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনায়। প্রদর্শনীর ভিতরেই শিল্পীদের থাকা খাওয়ার জায়গা করা হয়েছে। ত্রিশ তারিখ সকাল

বেলা আমাদেরও ঐ দলের সঙ্গে যোগ দিতে হবে, থাকতে হবে ঐখানেই।

ত্রিশে সকালবেলা আবার বেডিং বাঁধা, ট্রাকে মালপত্র তোলা। পুরো সাতদিনের এই বৈচিত্র্যময় জীবনের সমাপ্তি এইখানেই। সকাল দশটায় ট্রাক বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে গেল। বিদায় তাল-কাটোরা।

এখান থেকে গিয়ে পড়লাম অন্যজগতে। বিরাট প্রদর্শনী। দেশ বিদেশের অসংখ্য মডেল হাউস। ঝকঝকে তকতকে চওড়া রাস্তা, সবুজ লন। আর্ট থিয়েটার, বিরাট বিরাট শো রুম, টয় টাউন, লেক। লেকের ঘা ঘেঁসে ফ্যাশনেব্‌ল রেস্তোরাঁ, গে লর্ড (Gay Lord)। শীতের হিমেল হাওয়ায় ওভারকোট পরে সিগারেট মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সুসভ্য নাগরিকের দল। একবার ঢুঁ মারছেন ইন্দোনেশীয় বাড়িতে আবার ছুটে যাচ্ছেন পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রদর্শনী দেখতে। এক ফাঁকে কোআলিটি বা অন্নপূর্ণা কাফেটেরিয়ায় এক কাপ কফি খেয়ে সবান্ধবী নৌকোতে চড়ছেন। অলস ঔদাস্য নিয়ে লক্ষ্য করছেন ইতস্তত পথচারীর সপ্রতিভ পদক্ষেপ।

আমি ভাবছি, কোনটা আমাদের ভারতবর্ষ? এই চোখ ধাঁধাঁনো বিরাট প্রদর্শনী না সেই তালকাটোরা বাগ? এই সুসভ্য নাগরিকের দল না সেই আনন্দোন্মত্ত সরল গ্রামবাসী—যারা ভাষার বৈসাদৃশ্য, রীতিনীতির অসাম্য সত্ত্বেও একটি বিচিত্র ঐক্যতানের সৃষ্টি করেছে? কারা উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছে পরিপূর্ণ 'ভারত তীর্থের' ছবি?

এ ধরনের আপ্যায়নের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

শিশিরকুমার তাঁর ঘরে ঢুকতেই বললেন—"এই পোশাক পরে আমার সামনে আর আসবে না।"

আমি নিজের দিকে আপাদমস্তক চোখ বুলাই। ভাবি, কী এমন অশালীন পোশাক পরে ফেলেছি, যা নিয়ে ভদ্রলোকের বাড়ি যাওয়া যায় না!

অপ্রস্তুতির ধাক্কা সামলাবার আগেই সোফায় হেলান দেওয়া মাথাটা এদিক-ওদিক নাড়াতে নাড়াতে শিশিরকুমার আবার বললেন, "বুঝতে পার নি তো? পারবেও না। ছাই রঙের ঐটে কি পরেছ ঊর্ধ্বাঙ্গে?"

আমি যেন কাঠগড়ার আসামী। আমতা আমতা করে বলি—"কেন, জহরকোট!"

"তাই জন্যেই তো বলছিলুম। ঐ পোশাক পরে আমার সামনে এস না। জান না বোধ হয়, তোমাদের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালকে আমি পছন্দ করিনে। ওঁর নামে যে পোশাক, তাও আমার দু'চক্ষের বিষ।"

হকচকানো ভাবটা কাটিয়ে ইতিমধ্যে আমি কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করেছি। বললাম—"জওহরলালের প্রতি আপনি এত বীতরাগ কেন?"

"হব না!"—প্রায় লাফিয়ে উঠে উত্তেজনার সুরে বললেন—"জওহরলালই তো দেশ বিভাগের জন্য দায়ী। ইচ্ছে করলে তিনি দেশ বিভাগ রদ করতে পারতেন। কিন্তু করেন নি। দেশকে

যারা ভুভাগ করেছে, তাদের প্রতি বীতরাগ হবো না? বল কি হে ছোকরা? যাক, তোমাকে আর কি বলব, ছেলেমানুষ। তা, এখানে কি ব্যাপারে? কাকে চাই?"

"আজ্ঞে আপনার কাছেই এসেছি। আনন্দবাজার থেকে একটু আগেই আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম।"

"বুঝেছি, বুঝেছি, বস।"

আমি এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছি। ঘরের চারদিকে চোখ মেলবার ফুরসতও পেলাম।

সিঁথি-মোড়ের কাছাকাছি বি. টি. রোডের গায়ে লাল রঙের ছোট বাড়ি। দোতলায় সাধারণ মধ্যবিত্তের ঘর। তেল-চিটচিটে বিছানা। ওপাশে তক্তপোশের উপর ইতস্তত ছড়ানো একগাদা ইংরেজী-বাংলা বই, পত্র-পত্রিকা। চারিদিকে তাকের পর তাক। অজস্র বই তাকগুলি থেকে উপচে পড়েছে। 'তাক লাগানো' ঘরের দেওয়ালে শিশিরকুমারের কম বয়সের একটা ছবি, অন্য দেওয়ালের ছবি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের।

স্তূপীকৃত বইয়ের মাঝখানে সোফায় হেলান দিয়ে উদাস নয়নে তাকিয়ে আছেন গৌরবময় নাট্যসাম্রাজ্যের বাদশাহ আলমগীর। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের প্রতিভাধর নট শিশিরকুমার ভাদুড়ী। গায়ে ফুল-হাতা গরম গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গি, হাতে চুরুট। সত্তর বছর বয়সের ভারে দেহ অর্ধনমিত। চোখে চশমা। সন্ধ্যার অন্ধকারে ম্লান টেবিল-ল্যাম্পের আলো ছাপিয়ে বহু কাহিনীর, বহু ঘটনার সাক্ষী চোখ দুটো শুধু উজ্জ্বল, জ্যোতিষ্মান।

তারিখটা মনে আছে। জানুয়ারীর একত্রিশে, ১৯৫৯ সাল। ছাব্বিশে জানুয়ারীর প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ভারত সরকার শিশির-কুমারকে দিয়েছেন 'পদ্মভূষণ' উপাধি। খবর পেলাম, তিনি ঐ খেতাব ছেড়ে দিয়েছেন। সত্য-মিথ্যা যাচাই করার বাসনায় এক সাক্ষাৎকার নিতে তাঁর কাছে আমি এসেছি। গত পয়লা ফেব্রুয়ারী

'আনন্দবাজার পত্রিকায়' তাঁর সঙ্গে সেই সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল তারই কিয়দংশের পুনরাবৃত্তি এখানে করছি।

চেয়ে দেখি, ভুরুটা কুঁচকে শিশিরকুমার একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। সূচীপতন নৈশব্দ্য ঘুচিয়ে হঠাৎ বললেন—"পড়া-শোনা কিছু করেছ? বাংলা নাটক নাট্যশালা সম্বন্ধে কিছু জান? না জানা থাকলে কী আলাপ করবে আমার সঙ্গে?"

আমার সবিনয় নিবেদনে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—"পড়বে, আরও ভাল করে বাংলা নাটক পড়বে। অনেক কিছু জানার আছে। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসও ভাল করে পড়বে। সকলের পড়া দরকার। স্বাধীনতাপূর্ব-যুগে বাংলা দেশকে প্রেরণা দিয়েছে কে? এই নাট্যশালা। উদ্বুদ্ধ করেছে কে? এই নাট্যশালা। নানা চরিত্রের ভেতর দিয়ে ইংরেজ তাড়ানোর স্বপ্নও দেখেছে বাংলার নাট্যশালা। সেই নাট্যশালার আজ কোন কদর নেই। ভালো নাট্যশালাও নেই আজকাল।"

অনর্গল কথা বলতে বলতে শিশিরকুমার ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ফাঁক বুঝে আমি জানতে চাইলাম 'পদ্মভূষণ' উপাধির সম্মান তিনি কেন প্রত্যাখ্যান করতে চাইছেন।

সিগারেটের একটা কৌটোয় চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি বললেন—"ঐসব জিনিস আমি কোনদিনই পছন্দ করি নি। থিয়েটার ভালবাসি, নাট্যশালা ভালবাসি; বরাবরই তাই নিয়ে আছি। আমাকে হঠাৎ সম্মান দেখানোর ঘটা কেন? কালই ভারত সরকারকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিচ্ছি, 'তোমাদের এই সম্মান আমি চাইনে, সরকারী খেতাবে দরকার নেই আমার।'—শিশির কুমারের কণ্ঠে কিছুটা অভিমান, কিছুটা উষ্মা।

আমি বললাম—"আপনার নট-জীবনের স্বীকৃতি হিসেবে"—

"থাক আর বলতে হবে না।"—আমার কথা শেষ হবার আগেই ডান ভুরুটা কপালের উপর ছড়িয়ে দিয়ে উত্তেজনার সঙ্গে বললেন—

"স্বীকৃতি? কিসের স্বীকৃতি? আজ তিন বছর নাট্যশালা ছেড়ে এমনি বসে আছি। কই, কেউ তো কোনদিন এসে বললেন না, 'এসো তোমাকে একটা নাট্যশালা খুলে দিই, তোমার ইচ্ছেমত অভিনয় করে যাও।' আমার প্রতি দরদ থাকলে নাট্যশালার প্রতিও দরদ থাকতো। ঐ পদবী দেবার বদলে খুশী হতাম, এই কলকাতার বুকে ভাল একটা নাট্যশালা খোলার কথা সরকার যদি ঘোষণা করতেন! তাছাড়া ঐসব খেতাব, পদবী জিনিস-গুলোই ভুয়ো। কোন দাম নেই। শুধু কতকগুলি খয়ের খাঁ স্বষ্টি করার মতলব। বৃটিশ আমলে যেমন ছিল রায়সাহেব, রায়-বাহাদুর। আমি খয়ের খাঁর দলে নাম লেখাতে চাইনে।"

উত্তেজনায় তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন, গলা কাঁপতে থাকে। আমার মনে হয় এই ঘরটা যেন এক রঙ্গমঞ্চ, আর আমি যেন তাঁরই অভিনীত কোন এক নাটকে পাশে দাঁড়িয়ে মূকাভিনয় করে চলেছি। অভিনেতা শিশিরকুমার বাক্‌ভঙ্গীতে, হাতের মুদ্রায়, মুখের মাংসপেশীর দ্রুত সঞ্চালনে, ভুরু ওঠানামায় কখনও যেন মাইকেল, কখনও আওরংজেব, কখনও জীবানন্দ, কখনও বা রামচন্দ্র। একটার পর একটা দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে যায়। আমি নির্বাক, নিশ্চুপ।

হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে ফাঁকা দাঁতে ছোট ছেলের মত একগাল হেসে বললেন—"আসল কথা কি জান, এই দেশ নাটকের কদরই বুঝল না। না সরকার, না জনসাধারণ, কেউ না। তোমরা ছেলে-মানুষ। তোমরা জান না, স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসে এই নাট্য-শালার দান কত। গিরিশবাবু অর্ধেন্দুবাবু ওঁরা সব নমস্য ব্যক্তি। ইংরেজিতে একটা কথা আছে— এ নেশন ইজ নোন বাই ইট্‌স স্টেজ।' খাঁটি কথা। ডিউক অব ওয়েলিংটনকে কে মনে রাখবে? রাখে তো রাখবে সেক্সপীয়রকে, বার্নার্ড শ'কে।'

একটু থেমে নিভে যাওয়া চুরুটে আগুন ধরিয়ে আবার বলতে

শুরু করেন—"অনেক কথা বলার আছে। মুখ ফুটে বলা যায় না। এই ধর না, দেশ স্বাধীন হয়েছে। ভাল কথা। কিন্তু তার দাম দিতে হল দেশ দুভাগ করে। দ্বিখণ্ডিত এই দেশে স্বাধীনতার মূল্য কী? সাধে কি রাগ করি জওহরলালের উপর। কত আশা করে দেশবাসী দেশের ভবিষ্যৎ তাঁর হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। সুভাষ বসু থাকলে এমন কাণ্ড ঘটত না। সুভাষ ছিল সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। চেয়ে দেখ, আমার ঘরে আছে শুধু সুভাষচন্দ্রের ছবি। কী মনঃকষ্ট নিয়ে তাকে কংগ্রেস ছাড়তে হয়েছিল! এসব কথা মনে করলেই বহু অপ্রিয় কথা টেনে আনতে হয়। কাজ নেই অপ্রিয় কথায়, তার চেয়ে এস অন্য কথা বলি। কবিতা পড়? ইংরেজি কবিতা? ব্রাউনিংয়ের 'লস্ট লীডার' পড়েছ? দাঁড়াও তোমাকে কবিতাটা পড়ে শোনাই।"

শিশিরকুমার এদিক-ওদিক বইটা খুঁজতে থাকেন। পান না। বাড়ির একজনকে ডাকেন বইটা খুঁজে দিতে।

"চা খাবে? খাও না? কী আশ্চর্য! লেখার কাজ কর কি করে? তাহলে আরও একটু বস। তোমাকে পুরোনো কথা কিছু বলি। আজকাল কেউ বিশেষ আসে না। অন্তরঙ্গ দু'একজন ছাড়া। জানো, আমি যখন প্রথম ম্যাডান থিয়েটারে অভিনয় শুরু করি, তখন পুরো দু-বছর আমার নাম কোন খবরের কাগজে বেরোয় নি। একমাত্র বিজ্ঞাপন ছাড়া। রঘুবীর, আলমগীর, অন্য একটি নাটক—কি যেন নাম ভুলে যাচ্ছি—করা সত্ত্বেও না। তারপর 'সীতা' নাটক করলুম। এগিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাশ। দুজনেই খুব প্রশংসা করলেন। 'সীতা' নাটক নিয়ে 'ফরওয়ার্ড' কাগজে লিখলেন বিপিন পাল মশাই। পর পর তিনটি প্রবন্ধ।

আমি আবার 'পদ্মভূষণ' খেতাব প্রত্যাখানের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। বলি—"আপনি 'পদ্মভূষণের' খবর কখন পেলেন?"

"কাগজ পড়ে। ভোরবেলা খবরের কাগজ খুলে অবাক।

দেখি, আমি নাকি পদ্মভূষণ না কি যেন হয়ে গেছি। সরকারী ভদ্রতার ডেফিনেশন আমার জানা নেই, তবে এই ব্যাপারে আগে আমার অনুমতিটা অন্তত নেওয়া উচিত ছিল। দিল্লী থেকে টেলিগ্রাম পেলাম দুদিন পর। টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল 'শ্রীরঙ্গমের' পুরনো ঠিকানায়। আমি যে তিন বছর আগে 'শ্রীরঙ্গম' ছেড়েছি, এ সংবাদ ভারত সরকারের জানা না থাকলেও বাংলা সরকারের নিশ্চয়ই জানা ছিল।"

রাত বেড়ে যাওয়ায় বিদায় চাইলাম। বললেন, 'এস।' নমস্কার জানিয়ে চলে আসছিলাম। হঠাৎ ডেকে বললেন—

"দাঁড়াও। একটা কাহিনী তোমাকে শোনাই। তিন বছর আগের কথা। বাড়ি-ভাড়ার দায়ে 'শ্রীরঙ্গম' ছাড়তে চলেছি। তখন একজনকে ডেকে বলেছিলাম—'ঠিক আছে, টাকার অভাবে 'শ্রীরঙ্গম' না হয় ছেড়ে দিলাম, তাতে দুঃখের কি আছে। বাংলা দেশ ভাল নাট্যশালার কদর বোঝে। দেখো, এক বছর দেড় বছরের মধ্যে একটা কিছু নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। আজ তিন বছর পর তোমাকে বলছি—আমি সেদিন ভুল ভেবেছিলাম, আমি সেদিন ভুল বলে-ছিলাম।"

দরজার গোড়ায় আমি স্তব্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনি। ক্ষণ নীরবতা ভেঙে শিশিরকুমার বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন—"আচ্ছা, এস।"

তারপর আরও দুদিন শিশিরকুমারের বাড়ি গিয়েছিলাম। 'আনন্দবাজারে' তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ পড়ে তিনি খুশীই হয়েছিলেন; টেলিফোনে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, 'এস আর একদিন।'

পরের হপ্তায় আবার যেদিন তাঁর বাড়ি যাই, আমার সঙ্গে ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত (মৌলানা কাফী খান)।

সেদিনেরও একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল 'জাতীয়।' নাট্য-শালাটি কোথায় হবে, কিরকম হবে তার একটা খসড়াও তৈরি হয়ে

গেছে। নির্মলবাবু এই ব্যাপারে দারুণ উৎসাহী। শিশিরকুমার জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে একটি ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের জন্যে নির্মলবাবুর মারফৎ।

আনন্দবাজারের জন্যে ঐ ধরনের একটা প্রবন্ধ চাইলাম। বললেন—"বাংলা লেখার সময় নেই, চোখটা বড় 'ট্রাব্‌ল' দিচ্ছে। অপারেশান করাব শীগগির। বরং তুমি ইংরেজী প্রবন্ধ থেকে বাংলায় একটা খাড়া কর। আমি ছাপার আগে সংশোধন করে দেব।"

তারপর চলল পুরোনো দিনের থিয়েটার নিয়ে নানা ধরনের আলাপ। অধিকাংশ ঘটনাই শিশিরকুমারের অভিনয় জীবন নিয়ে। ঘরে আর একজন ভদ্রলোক ছিলেন, শিশিরকুমারের প্রত্যেকটি অভিনয়ের কথা যাঁর নখদর্পণে। কোন একটা ব্যক্তিগত কাহিনী বলতে বলতে শিশিরকুমারের যখন পুরো ঘটনা মনে পড়ছিল না, তখন ঐ ভদ্রলোকই বিস্মৃত অংশ মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন।

শিশিরকুমার হঠাৎ আমাকে বললেন, 'তোমাকে বলে রাখছি অমিতাভ, জাতীয় নাট্যশালা আমি দেখে যাবই।"

"হঠাৎ এত আশাবাদী হয়ে উঠলেন কী দেখে?"—আমি প্রশ্ন করি।

"কোষ্ঠী দেখে। এক জ্যোতিষী সেদিন এসেছিল আমার কাছে। বলে গেছে, দুবছরের মধ্যে আমার আশা পূর্ণ হবে। জাতীয় নাট্য-শালা প্রতিষ্ঠা ছাড়া আমার অন্য কোন আশা, অন্য কোন সাধ তো নেই।"

আমি জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী মুলতুবী রেখে বলি, আপনি ডাঃ রায়কে এই ব্যাপারে বললেই তো পারেন।

"বিধানবাবুর কথা বলছ? উনি আমার থিয়েটারের একজন বড় সমঝদার ছিলেন। প্রায় সব নাটকেই তাঁকে টিকিট কাটতে দেখেছি। কিন্তু তাঁকে বলে কোন লাভ হবে না। কয়েক বছর

আগে আমাকে একটা সরকারী পদ দিতেও চেয়েছিলেন। বিধান-বাবুর বাড়িতে কয়েকদিন যাওয়া-আসাও করি। কিন্তু মতে মিলল না। সরকারী পদ নিয়ে বিপদে পড়ি আর কি। ঐসব কাজের অনেক ফ্যাসাদ—সরকারের উদ্যোগে কোন নাটক নামালেই থাকবে ওদের হস্তক্ষেপ। আমার কোন হাত থাকবে না, ওদের ফরমাশ মত কাজ করতে হবে। ওসব আমার পোষায় না। সরকার এমন একটি নাট্যশালা করুন, যেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে প্রযোজকের; কিন্তু বিধানবাবুর কথায় ভরসা পেলুম না। 'না' বলে সোজা চলে এলুম। আর ওদিকে পা বাড়াই নি।"

"তারপর ভেবেছিলুম,"—শিশিরকুমার বললেন,—"জনসাধারণের সহযোগিতায় অভিনয়ের পালা চালাব। তাও হল না। অনেকেই অভিনয়ের দাবী নিয়ে আসেন। কিন্তু কারও কাছে টাকা নেই। ভাল নাটক নামাতে হলে টাকার দরকার। নূতন নাটক করার বড় ইচ্ছে। ক'দিন রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী'র রিহার্সেলও দিয়েছিলুম। কিন্তু টাকার অভাবে স্টেজে নামানো গেল না। এখন দিব্যি বেকার বসে আছি। ঘরে বসে চুরুট টানি আর জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্ন দেখি।"

আমি ও নির্মলবাবু যখন বিদায় নিলাম তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। যাবার আগে বললেন, 'মাঝে মাঝে এস, তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে ভাল লাগে।'

শিশিরকুমারের টেলিফোন পেয়ে আর একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম দুপুরবেলা। সেদিনই শেষ দেখা।

আমি দোতলায় উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি তিনি ফিটফাট সেজে নীচে নেমে এলেন। বললেন, "তোমাকে এ সময় ডেকে বড় অন্যায় করে ফেলেছি। এখন তো বেশীক্ষণ কথা বলতে পারব না। আমাকে এক্ষুনি ডাক্তারের কাছে চোখ পরীক্ষায় যেতে হবে। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যেবেলা বরং এস। তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।"

রাস্তায় নেমে আবার বললেন, "এখন কোথায় যাবে?"

"আপিসে।"

"তাহলে এস, তোমাকে পৌঁছে দিই, ট্যাক্সিতে। আমি তো ঐদিকেই যাব।"

আমি বললাম--"আপনি যান, আমি আপিসের গাড়ি নিয়েই এসেছি।"

কি জানি কি ভেবে তিনি বললেন—"তাহলে তো মিছিমিছি ট্যাক্সি ডাকলুম। আগে জানলে তোমার গাড়িতেই তো বেশ যাওয়া যেত। কয়েকটা টাকা বাঁচত।"

বললাম—'ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে চলে আসুন না এই গাড়িতে।'

"না থাক, আমি চলি। সন্ধ্যেবেলা এস।"—শিশিরকুমারের ট্যাক্সি সামনে এগিয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যেয় তাঁর বাড়ি আমার যাওয়া হয় নি। আর কোনদিনই যাওয়া হল না। উনত্রিশে জুন রাত্রি দেড়টায় হৃদরোগে তিনি মারা গেলেন। একেবারে হঠাৎ। তাঁর বহু ঈপ্সিত 'জাতীয় নাট্যশালা' দেখে যাবার সাধ অপূর্ণই রইল।

শুভময়

যত্নে রাখা কিছু স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে খুঁজে পেলাম একখানা অটো-গ্রাফ খাতা। তার একটি পাতায় লেখা—"All love is terrible, all love is tragedy." নীচে স্বাক্ষর "শুভময় ঘোষ, ১৯-এ মার্চ, ১৯৪৬।" সতের বছর পাঁচ মাস ছাব্বিশ দিন পর স্বাক্ষরদাতা নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করাল, ভালবাসা কত ভয়ানক, ভালবাসা কত নিষ্ঠুর।

শুভময় আমার গত কুড়ি বছরের জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশের ঘনিষ্ঠতম সঙ্গী। চিন্তায় কর্মে প্রেরণা দিয়ে, উৎসবে ব্যসনে সাহচর্য দিয়ে সে আমায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এমন একটা দিন ভাবতে পারি না, সে আমার কাছে নেই। এমন কোন কাজ ভাবতে পারি না, সে উপস্থিত নেই। যখন দূরে ছিল, কল্পনায় তার অনুপস্থিতি ষোল আনা পুষিয়ে নিয়েছি।

অথচ গত ১৫ই সেপ্টেম্বর সকাল ৬টা ১০ মিনিটে সেই শুভময়, আমাদের প্রিয়তম বন্ধু শুভময় কলকাতার একটি হাসপাতালে আমাদের সামনেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলল। চিকিৎসকদের সব পরিশ্রম, আমাদের সব শুভ কামনা নিষ্ফল করে চলে গেল। নানা বিদ্যা আর অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন সে নতুন জীবন শুরু করতে প্রস্তুত, ঠিক সেই সময়ে, মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে ঈশ্বর তাকে, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, সবচেয়ে রুচিবান ছেলেটিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন। নাকি ঈশ্বরেরও তার সাহচর্যের প্রতি লোভ ছিল?

শুভময় অসাধারণ কোন পুরুষ ছিল না। এমন কোন যুগান্তকারী কাজ সে করে নি, যা নিয়ে সন-তারিখ কণ্টকিত কোন প্রবন্ধ পুস্তক

লেখা যায়। এই রচনা আমার নিজস্ব স্মৃতিচারণ। মৃত্যু কিভাবে একটি সদানন্দময় জীবনকে অতর্কিতে গ্রাস করে, এর আগে আমি দেখিনি। বিচ্ছেদ কত ভয়ংকর, এর আগে আমি উপলব্ধি করি নি। তাই খানিকটা বুকের জ্বালা কমাতে, খানিকটা বন্ধুকৃত্য করতে আজ লিখতে বসেছি। আমি উপলক্ষ্য মাত্র, শুভময়ের অগণিত বন্ধুবান্ধব, অগণিত পরিচিত আমার জায়গায় নিজেকে দাঁড় করতে পারেন।

চোখের জলে এখন সব ঝাপসা, পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবু বলব, শুভময় একটি পরিপূর্ণ মানুষ। সম্ভবত শান্তিনিকেতনের একমাত্র সার্থক সৃষ্টি। দীর্ঘ বাষট্টি বছর শান্তিনিকেতন অনেক প্রতিভার জন্ম দিয়েছে, অনেক প্রতিভার স্ফূরণ ঘটিয়েছে, কিন্তু শিক্ষায়, রুচিতে, ব্যবহারে, আলাপে তার মত উজ্জ্বল চরিত্র আর আসে নি। আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ ধ্যানে যে-ছাত্রটিকে দেখেছিলেন, ঠিক যে-জিনিসটি আশ্রমের শিক্ষায় গড়তে চেয়েছিলেন, শুভময়ের মধ্যে তা দিনে দিনে রূপ পেয়েছিল। অভিনয়-নাচ-গান-আবৃত্তিতে অত্যাশ্চর্য দক্ষতা, কলা-সঙ্গীত-সাহিত্যে অপরিসীম জ্ঞান এবং বিনয়-নম্রতা-সদালাপ-রসবোধ ইত্যাদি মৌল অনেক গুণে সে ছিল সমৃদ্ধ। চরিত্রের এই প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের জন্যে তার সঙ্গ ছিল অনেক লোকের কাম্য। এমনও প্রায়ই ঘটেছে, ও আমার কাঁধে হাত দিয়ে চলেছে, কিংবা চায়ের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আছি, দুজনের মুখে কথা নেই। অথচ দুজনেই দুজনকে উপভোগ করছি।

সমবয়সীরা তো বটেই কনিষ্ঠরাও তার সঙ্গ পাবার জন্যে কিরকম লালায়িত ছিল, একটি ঘটনায় মনে পড়ছে। বছর এগার আগে পাঠভবনের একটি ছেলে শিক্ষাভবনে ভর্তি হওয়ার পরদিন বাড়ি ছুটে গর্বভরে বলেছিল—"জানো মা, ভুলুদা আজ আমাকে কালোর দোকানে চা খেতে বলেছিলেন।"

পরিচিত মহলে তার ডাক নাম ছিল ভুলু। গায়ে পাজামা-পাঞ্জাবি, মাথায় টোকা, কাঁধে রঙীন ঝোলা, ঝোলায় বই। কখনও

সে শালবীথি—আম্রকুঞ্জ দিয়ে চলেছে দলবেঁধে গান গেয়ে, কখনও একা বই পড়ে। কখনও নতুন ফুলের কুঁড়ি দেখে উদাস, কখনও সামান্য রসিকতায় হাসির প্রস্রবণ। চোখের সামনে অতি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কারও একটা মন্তব্য শুনে হাঁটতেই হাঁটতেই সে হাসির চোটে পেটে হাত চেপে বেঁকে পড়েছে।

ভুলু শান্তিনিকেতনের চলন্ত বৈতালিক। গান তার কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্ত। তার গলার গান শুনে আশ্রম বুঝত, এখন কোন্ ঋতু, আজ কোন্ তিথি। শুক্লপক্ষের একফালি চাঁদ আকাশে। হঠাৎ খেলার মাঠে গানের এক কলি: 'শুক্ল রাতে চাঁদের তরণী—।' কে গায় ওই?—ভুলু। ঝমঝম বৃষ্টি। আশ্রমের গাছপালায় হাওয়ার মাতন। হঠাৎ ছাতিমতলার কোণ থেকে দরাজ গলা: শালের বনে থেকে থেকে ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে, জল ছুটে যায়—।' কার গলা? ভুলুর। পিকনিকে হল্লা করে একপাল ছেলে হাত পা নেড়ে গান ধরেছে: "আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল ভবের পদ্মপত্রে জল, সদাই—।' সব ছাপিয়ে যার গলা সবচেয়ে প্রাণবন্ত, সে কে?—ভুলু।

শান্তিনিকেতনের পথঘাটে, আলোয় বাতাসে গত কুড়ি বছর যদি কেউ গান ছড়িয়ে থাকে, তবে সে দু'জন—ভুলু আর বিশ্বজিৎ। ১৯৫৭ সালে ভুলু শান্তিনিকেতন ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানের পথে গানও থেমে গেল। রবীন্দ্র-সংগীতকে পোশাকী বাঁধন থেকে মুক্ত করে আটপৌরে রূপ দেওয়ার পেছনে ভুলুর দান অনেকখানি। ট্রেনে চলেছি, হাত পা নেড়ে বাল্মীকি প্রতিভা পুরো গেয়ে দিল। পূর্বপল্লীর মাঠ দিয়ে রাতদুপুরে চলেছি। ভুলুর গলার 'নিশীথ রাতের প্রাণ' শুনে অন্ধকার খানখান হয়ে গেল। কথা বলছে, গল্প করছে, ফাঁকে ফাঁকে গান চলছে। দ্বারিকের পাশ দিয়ে শোনা গেল বিশ্বজিতের গলা—'এই তো ভাল লেগেছিল—।' পুরোনো কলেজ হোস্টেলে আমার ঘর থেকে জবাব দিল ভুলু—'শালের নাচন পাতায়

পাতায়।' আমি গান গাইতে পারি না। তিনজনে যখন হাঁটতাম, ওরা সব সময় গাইত 'খুলিয়া গলা', আমি গাইতাম 'মনে মনে।'

রবীন্দ্র-কবিতা আবৃত্তিতে আজও সে অদ্বিতীয়। কণ্ঠে এমনই মাদকতা, শুনে রোমাঞ্চ হয়। অনেকের গান যেমন আবৃত্তির মত শোনায়, ভুলুর আবৃত্তি তেমনি গানের মত গুঞ্জন তোলে। কী হাসির, কী গুরু-গম্ভীর, সব নাটকে ভুলু না হলে চলে না। ১৯৩৯ সালে যখন ডাকঘর হবার কথা, রবীন্দ্রনাথ তাকে বেছেছিলেন অমলের ভূমিকায়। অনেক বছর পরে সাজে দইওয়ালা। কালমৃগয়ায় অন্ধমুনি, তাসের দেশে রুইতনের সাহেব, শেষরক্ষায় গদাই, ফাল্গুনীতে চন্দ্রহাস (১৯৬২ সালের বসন্তোৎসবে তার শেষ অভিনয়)—কত নাম করব! ১৯৪৭ সালে যখন ভুলুর উৎসাহে ভুশণ্ডীর মাঠের নাট্যরূপ দিলাম, সে সাজল শিবু ভটচাজ। হ-য-ব-র-ল'তে 'আমি'। এবং 'তেপান্তরের মাঠে' নিয়ে যখন দল বেঁধে কলকাতা ও শিলং গেলাম, সে নাটকের নায়ক—রাজপুত্তুর। 'লম্বকর্ণ' পালাতে তার যাত্রা পার্টির লোকের অভিনয় কে ভুলবে। বিশ্বভারতীর দল যখনই শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা নিয়ে বাইরে গেছে, ভুলু এক নাগাড়ে অনেক বছর গানের দলে।

বাউল নাচে সে ছিল পাকা ওস্তাদ। শুধু ওর নাচের জন্যেই আমার দুটি গীতি-নাটিকায় বাউল-গান রাখতে হয়েছে। 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে' গানটির সঙ্গে যখন সে একহাত বুকের কাছে নিয়ে অন্য হাত শূন্যে তুলে ঘুরে ঘুরে পা ফেলত, মনে হত সে আর এই জগতে নেই। ঠোঁটে অপার্থিব হাসি, চোখ সুদূরের পিয়াসী। আম্রকুঞ্জের বসন্তোৎসবের অনুষ্ঠানের পর পুরোনো ঘণ্টা-তলায় সংগীত-বৃত্তের মাঝখানে গলার বাসন্তী চাদর কোমরে জড়িয়ে তার নাচ শুধু উচ্ছল মাতলামিই ছিল না, তাতে ছিল রঙে রসে উদ্বেল প্রকৃতির কোলে নিজেকে উৎসর্গ করার কাতরতা।

বসন্ত ছিল তার প্রিয় ঋতু। আমি ভালবাসতাম বর্ষা, সে

বসন্ত। এই নিয়ে দুজনে কত তর্ক। সালিশ মানতাম বিশ্বজিৎকে। শান্তিনিকেতনে বসন্তাগমের চমৎকার এক বর্ণনা রয়েছে প্রায় চৌদ্দ বছর আগে লেখা ওর চিঠিতে—

৩০শে জানুয়ারী (১৯৪৯)

অমিত,

এখানকার আলোবাতাসে বসন্তবাহারের আমেজ এরই মধ্যে অল্পস্বল্প লেগেছে। গাছের ডালে দু' একটা বসন্তবাউরীকে মাঝে মাঝে উড়ে বেড়াতে দেখা যায়। কোথায় কী একটা যেন হচ্ছে, বেশ বোঝা যায়। ঘাসের ডগা থেকে শাল গাছের মাথা পর্যন্ত সবখানেই একটা ecstasy'র ছোঁয়া দেখা যাচ্ছে। অল্প একটু চাঞ্চল্য, খুব বিরাট হয়ে ওঠে নি এখনও। কিন্তু তবুও ওইটুকুই বেশ সাড়া পড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু একটা হচ্ছে, কিছু একটা আসছে—খুব refreshing আর enloving. উত্তরের হাওয়াটা এখনও দক্ষিণে সরে যায় নি ! কিন্তু ওই হাওয়াতেই কোথায় যেন হঠাৎ স্ফূর্তি—লাগানোর কী একটা মিশে গেছে। যার জন্যে আমাদের মনের অবস্থা অনেকটা 'পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা' গোছের হয়ে আছে। সমস্ত আশ্রমের অবস্থাটা যেন অপেক্ষা করে আছে। বলছে, 'আমরা প্রস্তুত, তুমি একবার এসে দেখ, নাচে-গানে-রঙে-রসে-হাসিতে-হল্লায় সমস্ত আকাশ বাতাস কেমন মাতিয়ে তুলি।'—যার ফল হল আমাদের দোল পূর্ণিমার height of ecstasy, উচ্ছল মাতলামি।

এখনকার অবস্থাটা যেন দু'পেগ জিন খেয়ে মাথাটা একটু হালকা ঠেকছে। পা দুটো অল্প অল্প ভাসছে। চোখের পাতায় বেগুনী আর লালের হালকা ছোঁয়া লাগছে। তৃষ্ণা বেড়েছে, কিন্তু ভয়টা এখনও ছাড়ে নি। চোখে রঙের মেশা, আর নেশার রঙ দুটোই লেগেছে। 'হঠাৎ-লাফিয়ে-ওঠা' মনটা ভাবছে, দিই একেবারে শেষ করে! কী হবে ভেবে ? কিন্তু একেবারে desperate হতে পারছি না। কোথাও একটা ভয়ের প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।······

সত্যি বলতে কি আজ গান্ধীজীকে তেমন মনে পড়ছে না। যত পড়ছে গুরুদেবকে। গুরুদেবের ক্ষণিকা, মহুয়া, পূরবী, গীতি-বিতান এক সঙ্গে মিশে গিয়েছে এই আবহাওয়ার সঙ্গে। কবিতা-গুলোকে যেন দেখতে পাচ্ছি ছুঁতে পাচ্ছি—সোনালী রোদে, হালকা হাওয়ার, পাতায়, ফলে-ফুলে। তা বলে মনে করিস না যে, খুব কবিতা পড়ছি। পড়ার তো দরকার হচ্ছে না। বললামইত, কবিতা দেখছি, কবিতা ছুঁচ্ছি।......

দোল সে এত ভালবাসত, কলকাতায় যখন চলে এলাম আমাকে টেনে নিয়ে যেত। কোনবার না গেলে লিখেছে—"দোলের দিন একা একা আর কত সেই বাউল নাচ করা যায়। তুই না থাকায় নাচ কিছুই খুলল না।" মস্কোর প্লেন ধরার ঠিক আগে দিল্লির বিমান বন্দর থেকে লিখেছে—"দোলে শান্তিনিকেতনে ঠিক যাস কিন্তু।" আমি গেলে ওর যাওয়াও হবে যে!

পিকনিক, এক্সকার্সন ভুলু ছাড়া আমরা ভাবতে পারি না। ওর জন্যেই প্রতি বছর শীতের সাত রাত আমাদের কয়েকজনকে জাগতে হয়েছে। অ্যাকটিং ক্যাটিগরি, শারাড—সব রকমের বুদ্ধির খেলায় সে সবার বাড়া। মনে পড়ছে, ক্যাম্প-ফায়ারে ধুনি জ্বালিয়ে রাত হুটোয় কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছি। শিথিল স্নায়ুতে কারণ অকারণে হো-হো হা-হা হেসে চলেছি। রাত যত বাড়ে, মন তত উজাড়। এমন সময় হঠাৎ পূব আকাশ লাগে লাল। ভুলুর কম্বলের ফাঁক থেকে ধীরে বেরিয়ে এল—'প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠল বেজে যেই।' আমাদের সব ক্লান্তি মুছে গেল।

ভুলুর বাতিক বই পড়ায়। হাসি ঠাট্টা, ঘোরাঘুরির মাঝখানেও সে বই পড়ত। তখন তার অন্য চেহারা, সে তন্ময়। বাড়িতে বানিয়েছে বিরাট লাইব্রেরি। সেখানে শিল্প সমালোচনার বই যেমন তখন আছে ক্রিকেটের বই। ইংরেজি, বাংলা—তুই সাহিত্যের ধারা তার নখাগ্রে। কলকাতায় এসে তার প্রথম কাজ ছিল বই

কেনা। বইয়ের ঢাউস দুই বাক্স এখনও কলকাতার পথে জাহাজে।

যা পড়েছে, তার তুলনায় লেখা কম। সাহিত্য জীবনের শুরু লিন-ইউ-তাঙের অনুবাদ দিয়ে। সাংবাদিক জীবনের শুরু শান্তি-নিকেতনে আনন্দবাজার গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হয়ে। পরে প্রতিনিধি হল মস্কোয়। তার লেখা শান্তিনিকেতনের চিঠি আর মস্কোর চিঠি রসিকজনের প্রশংসা কুড়িয়েছে ভাষার প্রসাদগুণে, বিশ্লেষণের সরলতায়। রামকিঙ্কর, নন্দলাল এবং বিনোদবিহারীর ছবি সম্পর্কে তার তিন প্রবন্ধ বুদ্ধিদীপ্ত। লিখত অতি দ্রুত। হয়তো কোয়াপের গোল চক্করে বসে আড্ডা মারছি। আমাদের কথায় ভুলু মন্তব্য করছে, বা ঠোঁট চেপে মুচকি হাসছে এবং খসখস কী যেন লিখে চলেছে।

"কী রে কী লিখছিস এতো?"

"আলাউদ্দিন খানের জীবনী। মেজদা লিখেছে তাড়াতাড়ি পাঠাতে"—লিখতে লিখতেই জবাব দিল ভুলু। এক ঘণ্টায় লেখা শেষ।

সে ছিল স্বভাব-বিনয়ী। দুটি আদর্শ ছিল প্রধান—গুণী আর গুরুজনে সম্মান দেখাতে হবে এবং বন্ধুত্বে স্বার্থপরতার স্থান থাকবে না। তার আচরণ ছিল পরিশীলিত। কিন্তু বরাবর চাপা স্বভাবের। থাকতে চাইত পেছনে। নিজের লেখা সম্পর্কে ছিল কুণ্ঠা। কোন অনুষ্ঠানে একা গান গাইতে চাইত না। দলের খেলা বলে ক্রিকেট ফুটবলের মাঠে নামত দারুণ উৎসাহে; কিন্তু ভাল ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় হয়েও সিঙ্গলসে সে বরাবর গররাজি। র‍্যাকেট হাতে বলত—"না, না, আমি ডাবলস খেলব, অমিত আমার পার্টনার।"

সব কাজেই সে আমার পার্টনার। আমার লেখারও সে প্রধান প্রেরণা। লিখতাম এত সাবধানে, ভুলুর যেন খারাপ না লাগে। সিনেমা-পত্রিকা থেকে লেখার অনুরোধ আসতে আমি তার অনুমতি

চেয়েছিলাম। সে বলেছিল—'দেখ, আমি গোঁড়ামিতে বিশ্বাস করি না। কেন লিখবি না, আলবৎ লিখবি।'

ভুলু যে কত চাপা স্বভাবের তার উদাহরণ 'ঋতুপত্র।' ১৯৫৫ সালে ওর উৎসাহেই প্রকাশ করি এই সাহিত্য-পত্রিকা আমি সম্পাদক, ভুলু প্রকাশক, বিশ্বজিৎ পরিচালক। খরচ চলত গাঁটের টাকায়। ভুলু তো একবার নিজের মাইনের পুরো টাকাটাই প্রেসে দিয়ে দিল। প্রথমে ঠিক ছিল সম্পাদক হিসেবে নাম থাকবে আমাদের দুজনের। বিজ্ঞপ্তিও সেইভাবে বেরোল। কিন্তু ভুলু কিছুতেই রাজি নয়। আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও একদিন প্রেসে গিয়ে লুকিয়ে নিজের নাম কেটে দিল।

ভুলু আমার সমবয়সী, সহপাঠীও। প্রথম আলাপ ১৯৪৪ সালে। শান্তিনিকেতনে পড়তে এলাম যে বছরে। পরিচয় হল হাতে-লেখা পাক্ষিক বৃহস্পতির মারফৎ। ভুলু বিশ্বজিৎ, সুবীর তার উদ্যোক্তা। একটা ছড়া দিলাম বৃহস্পতিতে। সেই আমার প্রথম ছড়া লেখা। মনোনীত হল। এবং ভুলু এল আলাপ করতে। সেই আলাপ জমল মধুর সম্পর্কে।

তারপর থেকেই সে আমার সুখ-দুঃখের সাথী, সহচর, প্রিয়জন। দুজনে মতের অমিল ছিল প্রচুর, কিন্তু ভুলু সেটাকে সবচেয়ে বেশী দাম দিত—সেন্স অব হিউমার, আমরা একই ভাবে সমান উপভোগ করতে পারতাম। সে পরে একদিন আমার খাতায় লিখেছে—"A joke is the shortest distance between two points of view."

তার ছেলেবন্ধুর সংখ্যা অপরিমিত। ছোট বড় সমবয়সী—অনেকে। বিশ্বজিৎ, হাবলু, অরুণ, সুবীর, সুনীল, সুধীর, নারায়ণ, পূর্ণানন্দ, শান্তিপ্রিয়, শৈবাল, অনীশ, সুগত, বরেন, তপেন, বিভাস, প্রবীর, সুকীর্তি, সুব্রত, সুপ্রিয়, কল্যাণ, প্রবুদ্ধ জিতেন্দ্রসিং, অজয়—অসংখ্য জন। সবাই আসত যেত, এক নাগাড়ে অনেক বছর এক

সঙ্গে ছিলাম তিনজন—ভুলু, বিশ্বজিৎ আর আমি। ভুলুর প্রতি বিশ্বজিতের ভালবাসার সঙ্গে মিশে ছিল স্নেহ, আমার ভালবাসায় মেশা শ্রদ্ধা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা ঘুরেছি, তর্ক করেছি, অদ্ভুত উদ্ভট কল্পনায়, হাসি-ঠাট্টায় লুটিয়ে পড়েছি। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল, একটা আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা গোটা পৃথিবীকে দেখতে পারতাম। সেই কোণ ছিল অন্যের অগোচর। তাই অনেক সময় আমাদের কথা বলতে হত না, চোখের সামান্য ইশারায় সব বুঝে ফেলতাম। সঙ্গে চতুর্থ কেউ থাকলে হত হতভম্ব।

রাত্রে শুয়ে আছি। হঠাৎ দরজায় টোকা।—"হেই পাজি, দরজা খোল।" ভুলুর গলা। ওদিকে জানালা দিয়ে বিশ্বজিৎ আমার মশারিতে খোঁচা মারছে। উঠে তিনজন বেরোলাম মাঠে। কিংবা খোয়াইয়ের দিকে। গল্পে গানে রাত কাবার। হঠাৎ মাঝরাত্তিরে হাজির হতাম অশোকদা বা অমিয়দার বাড়ি। কিংবা হীরেনদা বা অনিলদার বাড়িতে বসে আড্ডা—সেও তিনজন আছি একসঙ্গে। তিনজনেই ঘুরে বেড়িয়েছে সারা ভারতবর্ষ। রাজস্থান, দিল্লি, বম্বে, পাটনা, শিলং, শিলচর। কোন বার একজন বাদ পড়লে মন খারাপ হয়ে যেত। একবার পাটনাগামী 'তাসের দেশ' পার্টিতে আমি ঠাঁই পেলাম না বলে ভুলু বিশ্বজিৎ শান্তিদাকে বলে আমায় প্রম্পটার বানিয়ে নিয়ে গেল। বৃদ্ধ বয়সে অবসর-জীবন কীভাবে এক সঙ্গে কাটাব, তাও আমরা ছক কেটে রেখেছিলাম। কিন্তু কী বোকা আমরা, মৃত্যু সে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অন্তরায় হতে পারে, মনে আসে নি।

১৯৫৬ সালে আনন্দবাজারে চাকরি নিয়ে কলকাতায় এলাম। চাকরির গণ্ডগোল হওয়ায় ভুলুও কিছুদিন পর শান্তিনিকেতন ছাড়ল বিশ্বভারতীর উপর প্রচণ্ড অভিমান নিয়ে। পেল মস্কোর চাকরি। যাবার কিছুদিন আগে বিয়ে করল বিশ্বজিতের বোন সুপ্রিয়াকে। মার্চ মাসের গোড়ায় আমরা ওকে হাওড়ায় ট্রেনে তুলে দিলাম। সে

দিল্লিতে গিয়ে মস্কোর প্লেন ধরল। সেখানেও সে সবার হৃদয় জয় করল। নিষ্পাপ হাসি, সহজাত গুণ আর শিশুর সারল্য দিয়ে। মস্কোতে ছেলে হল একটি। ডাক নমে কুকুল। আমার বিয়ের খবর পেয়ে যখন ছুটি এগিয়ে ১৯৫৮ সালের শেষ দিকে দেশে ফিরল সঙ্গে ফুটফুটে শিশু কুকুল—যেন ক্যাস্পিয়ানের নীলজল থেকে এক দেব-শিশুকে তুলে নিয়ে এসেছে। এই প্রথম বাৎসল্য রসের সন্ধান পেলাম। এবং ভুলু-সুপ্রিয়ার মুখেও দেখলাম তৃপ্তির চিহ্ন, বুদ্ধির আরও দীপ্তি।

সাড়ে ছ' বছর রইল মস্কোয়। বাংলা বইয়ের অনুবাদক হিসেবে। ইতিমধ্যে শিখে ফেলল রুশ ভাষা। বেড়িয়ে এল ইউরোপের অন্যান্য দেশ। পেল প্রচুর সম্মান, প্রচুর খ্যাতি, প্রচুর অর্থ। জীবনকে করল কানায় কানায় উপভোগ। এই বছর আগস্ট মাসের চার তারিখ পাকাপাকি ফিরল কলকাতায় আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিক হেসেবে যোগদানের বাসনা নিয়ে। কলকাতায় ওর সঙ্গে ঘুরলাম কয়েকদিন। কাস্টমস থেকে মাল ছাড়ালাম, চীনে রেস্তোরাঁয় খেলাম। সিনেমা দেখলাম। চারটি টিকিট কেটে বলল—"তোর বউকে না আনলে সিনেমা হলে ঢুকতে দেব না।"

ফ্লাট নিল আমার বাড়ির কাছে।—"বেশ হবে, অমিতটা কাছাকাছি থাকবে, রোজ দু'বেলা দেখা হবে।" বাড়ি কীভাবে সাজানো হবে, তাই নিয়ে সুপ্রিয়া, ভুলু ও আমার মধ্যে নানা জল্পনাকল্পনা। ওকে নিউ আলিপুরের বাজার দেখালাম। "সুপ্রিয়া, এখানে বাজার করবে। মাও আসেন এখানে মাঝে মাঝে।" কথা উঠতেই ভুলু চেঁচিয়ে উঠল—"চল সুপ্রিয়া, মাসিমাকে দেখে আসি।"

আমার বাড়িতে অনেকক্ষণ আড্ডা। ভুলুর লেখা চিঠি আলাদা করে রেখেছিলাম। বললাম, "আর একদিন এলে এক সঙ্গে পড়ব। অনেক পুরোনো কথা আছে।"

মা নিয়ে এলেন মাছ ভাজা। ভুলু প্লেট হাতে নিয়ে একগাল হেসে বলল—"মাসিমা, ফার্স্ট ক্লাস।"

আমার অনেক দিনের সখ ভুলুর গান, আবৃত্তি রেকর্ড করে রাখব। টেপ রেকর্ডার বের করলাম। রেকর্ড করা হল না। ভাবলাম, থাক, ওতো আসছেই, ধীরে সুস্থে করা যাবে।

তিরিশে আগস্ট হুপুরের ট্রেনে গেলাম শান্তিনিকেতন। ভুলু সুপ্রিয়া, সাগরদা, হাবলু, আর আমি। সারাপথ গুলজার।

৩১শে আগস্ট সারাদিন ঘুরলাম এখানে ওখানে। কলকাতায় কীভাবে কাটাব, তাই নিয়ে অনেক আলোচনা। হঠাৎ বলল—"আমি ভাল ক্রিকেট খেলা দেখিনি। এবারের কলকাতা টেস্টের একটা টিকিট আমার জন্যে রাখবি। কথা দে—"

রাস্তায় অমিয়দার সঙ্গে দেখা। দূর থেকেই বললেন—"এই যে অমিত বুঝি তোমায় আনন্দবাজারে নেবার জন্যে পটাচ্ছে। ওসব হবে না, তোমাকে আমরা শান্তিনিকেতনে রাখবই—" তিনজনে হা-হা করে হাসলাম।

বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়ার পর তাস খেলা। ভুলু নিজেই তাস কিনে নিয়ে এল। সাগরদা, বড়বউদি (শান্তিদার স্ত্রী), সুপ্রিয়া আমি পূর্ণানন্দ। ভুলু তাস খেলে না, কিন্তু উৎসাহ প্রচুর। সে মেঝেয় মাহুর বিছিয়ে বালিশে বুক চেপে বিশ্বভারতী পত্রিকার জন্যে লেখা নিজের প্রবন্ধের (চেকফের নাটক) প্রুফ দেখতে লাগল। ওর ছাত্র-জীবনের অভিলাষ বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকে লিখবে।

খানিক বাদে এল সুকীর্তি কর, হাবলু আর তার বউ কৃষ্ণা। তাসের সঙ্গে আড্ডা জোর জমে উঠল। ভুলু আর সুকীর্তিই কফি বানিয়ে আনল। রাত তখন বারটা। ভীষণ গরম। আমি ভুলু হুজনেই গায়ের জামা খুলে ফেলেছি। ভুলু পাশে বসে নানা রকম মন্তব্য করছে, অন্যের মন্তব্যে হাসছে, আর আমার পিঠে সুড়সুড়ি

দিচ্ছে। বড়বউদি বললেন—'ও কী করছ ভুলু?' ভুলু বলল—"ওকে আমি এখন দিচ্ছি। রাত্তিরে ও আমায় দেবে।"

১লা সেপ্টেম্বর, হঠাৎ বিকেল বেলা বলল, গা ম্যাজম্যাজ করছে। থার্মোমিটার লাগিয়ে দেখা গেল, টেম্পারেচার ৯৯ ডিগ্রি। নিশ্চয়ই ইনফ্লুয়েঞ্জা।

বাড়ি ফিরে দেখি ভুলু জেগে আছে।—"কী রে, এখন কেমন আছিস?" জবাবে বলল—"আয়, কাছে বস।" বসলাম। বসে চুলে আঙুল বুলিয়ে দিলাম, বুকে হাত বুলিয়ে দিলাম, ওপাশে সুপ্রিয়া।

পরদিন ২রা সেপ্টেম্বর, আমি সাগরদা, সুকীর্তি ও হাবলু কলকাতা রওনা হলাম। ভুলু অনেকটা ভাল। বিদায় নেবার আগে বলল—"আসছে সোমবার আমরাও আসছি। আনন্দবাজারে কাজ ঠিক হলে ১৫ই থেকে যোগ দেবার ইচ্ছে।"

"আচ্ছা অমিত।"

"আচ্ছা, ভুলু।"

শেষ কথা বলে কলকাতা চলে এলাম। ৭ই সেপ্টেম্বর, শনিবার শান্তিনিকেতন থেকে চিঠিঃ ভুলুর কামলা রোগ হয়েছে।

৮ই সেপ্টেম্বর, রবিবার বিকেলে বাড়ি থেকে বেরোব বেরোব করছি, হঠাৎ সাগরদার বাড়ি থেকে টেলিফোন—সর্বনাশ, ভুলুর মারাত্মক অসুখ! ট্রাঙ্ক কল এসেছে। এক্ষুনি ডাক্তার নিয়ে যেতে হবে।

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। সর্বনাশ!

ছুটলাম সাগরদার বাড়ি। কানাইদাও এলেন। রাজি করানো হল খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ নলিনী কোনারকে। ডাঃ কোনার, একগাদা ওষুধপত্তর আর দুশ্চিন্তা নিয়ে রাত নটার ট্রেনে শান্তি-নিকেতন ছুটলাম। সারাপথে উদ্বেগ, না জানি, ভুলু কেমন আছে!

বোলপুর স্টেশনে রাত পৌনে বারটায় বিশ্বজিতের দাদা রণজিৎদা

দাঁড়িয়ে। গম্ভীর মুখ। কথা বলার সাহস হল না। দশ মিনিটে পৌঁছলাম ভুলুর কাছে। দেখে শিউরে উঠলাম।

ডাঃ কোনার সব বৃত্তান্ত শুনলেন। রোগীকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ দেখলেন। তাঁর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে গেল।

সিদ্ধান্ত হল ভুলুকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হবে। ডাঃ কোনার বললেন, "'একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।"

৯ই সেপ্টেম্বর, ভোরবেলা গাড়ি করে ওকে অজ্ঞান অবস্থাতেই বোলপুরে নিয়ে এলাম। এমনিতেই ওর কলকাতায় যাওয়ার কথা ছিল। আশ্চর্য, অন্য এক বিপরীত পরিস্থিতিতে ঠিক ওই দিনেই আমরা ওকে নিয়ে যাচ্ছি।

সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ। তবু পথ যেন ফুরোয় না। ড্রাইভারের কাছে আমার তখন মনে মনে কাতর প্রার্থনা: তাড়াতাড়ি ট্রেনটা শিয়ালদায় পৌঁছে দাও। তাড়াতাড়ি, আরও তাড়াতাড়ি। আমার অসুস্থ বন্ধু ট্রেনে। এক মিনিট সময়ের আজ বড় দাম। ওকে অবিলম্বে হাসপাতালে পৌঁছতে হবে। ওইখানেই আমাদের শেষ আশা।

অবশেষে পৌঁছলাম শিয়ালদায়। সেখান থেকে অ্যামবুলেন্সে পি জি হাসপাতালে। হাসপাতালের ম্যাকেঞ্জি ওয়ার্ডে সেপারেশন কেবিনে সীট রিজার্ভ।

তারপর শুরু হল বিজ্ঞানে-যমে লড়াই। ডাঃ কোনারের জিদ চেপে গেল, বাঁচাতে হবে। ডাঃ মণ্ডল, ডাঃ চ্যাটার্জি, কয়েকজন নার্স, সকলেরই একই জেদ—বাঁচাতে হবে। তাঁরা নিলেন চ্যালেঞ্জ। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হল ভুলুর শরীরে।

ওদিকে আমরা, তার আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুরা, বাইরে দাঁড়িয়ে। মনে উদ্বেগ। মিনিট যায়, দিন যায়, রাত যায়, আমরা সামনের চত্বরে গাছের তলায় একঠায় অপেক্ষা করছি। খবর পেয়ে ছুটে এল

চেনা সবাই। সকলের মনে এক প্রার্থনা: ভগবান, এত নিষ্ঠুর হয়ো না, ভুলুকে বাঁচাও।

ভগবান নিরুত্তর। ভুলুর অবস্থা একই রকম। মঙ্গলবার বিকেল থেকে শুরু হল অক্সিজেন। ব্লাডপ্রেসার নেমে এল নব্বুইয়ে। ইউরিনও ভাল আসছে না। ভুলুকে দেখে এলাম। তাকানো যায় না। নাকে নল, হাতে নল, পায়ে নল। চোখ বোজা, গভীর ঘুমে অচেতন।

বুধবার একটু আশার আলো। ব্লাডপ্রেসার উঠেছে। ইউরিনও একটু বেরিয়েছে। পাল্‌স মন্দ নয়। হঠাৎ কে একজন খবর নিয়ে এল, চোখের পাতা একটু নড়েছে। প্রতিক্ষারত আমরা কোরাসে বললাম—সত্যি, সত্যি, সত্যি ?

বৃহস্পতিবার আর একটু আশা। ঠোঁট নাকি একবার নড়েছে। শুক্রবার অবস্থা একই রকম। অর্থাৎ আর অবনতির দিকে যায় নি। সাগরদা গম্ভীরমুখে এক নাগাড়ে দাঁড়িয়ে। সুপ্রিয়া নামতেই বললেন—"আজ সুপ্রিয়ার মুখে শুনতে চাই, ভুলু কেমন ?" সুপ্রিয়ার মুখে এই প্রথম একটু হাসি দেখা দিল: "আজতো ভালই লাগছে মেজদা।"

আমরা খানিক স্বস্তি নিয়ে রাত নটায় বাড়ি চলে গেলাম। রইলেন মন্টুদা, সমরেন্দ্রদা, রণজিৎদা। সারা রাত বৃষ্টি। একটু চোখ লাগল। কিন্তু সকালবেলা টেলিফোন পেয়ে মাথা ঘুরে গেল: ভুলুর অবস্থা সিরিআস। ব্লাডপ্রেসার নেমে গেছে, ইউরিনও বন্ধ।

মাকে নিয়ে ছুটলাম হাসপাতালে। বৃষ্টির জল ঠেলে। আস্তে আস্তে এলেন আরও অনেকে। ডাঃ কোনার ডেকে আনলেন কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে। সবারই মুখ গম্ভীর। সাহস করে কাউকে কিছু জিগগেসও করা যাচ্ছে না।

দুপুর গেল, বিকেল গেল, রাত নামল। অবস্থা আরও অবনতির দিকে। আমরা ছটফট করতে লাগলাম। চত্বরে গাছের তলা

থেকে দাঁড়িয়ে ভুলুর ঘর দেখা যায়। সেখানে নার্স ডাক্তারদের ব্যস্ততা। এদিকে সাগরদার মুখ আরও গম্ভীর। মন্টুদার চোখে জল, শান্তিদার হা-হুতাশ। সুপ্রিয়া, বুড়িদি, কল্যাণীদি ভেঙে পড়েছে।

ভুলুর ঘরের দিকে চেয়ে আমি ভাবছি, কত রাত ওর সঙ্গে কাটিয়েছি, গত সাত রাতও কাটালাম, কিন্তু কাছে থেকেও ও কত দূরে। ঠিক ছিল, ও কলকাতায় এলে আমাদের রি-ইউনিয়ন হবে। হাসপাতালে ওকে কেন্দ্র করে সেই জিনিসই হল, কিন্তু কী অদ্ভুত পরিস্থিতিতে!

একটা কথা মনে পড়ে ভয় বেড়ে গেল। একটা ছবিতে ছিল ভুলু আর ওর দুই সহপাঠী—ডল ও সুজিৎ। সুপ্রিয়াকে খেপাতে সেদিন বলেছে, "ডল মরেছে, সুজিতও, আমিও শীগগীর মরে যাব।" ভুলুর রসিকতায় তখন আঁতকে উঠি নি, এখন আঁতকে উঠলাম।

অধীর আগ্রহে আমরা প্রহর গুণছি। চারদিকে থমথমে ভাব। রাত নটা। কোণের ঘর থেকে বেজে উঠলো রেডিও। কে যেন রবীন্দ্র সংগীত গাইছে—"যা পেয়েছি প্রথম দিনে, সে-ই যেন পাই শেষে?"

আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। এ যে ভুলুর অন্যতম প্রিয় গান! এ সময়ে এ গান কেন? গানের কথাগুলোও যেন কেমন কেমন!

সাড়ে নটায় ডাঃ কোনার নীচে নেমে এলেন। আমরা এগিয়ে গেলাম। তিনি দাঁড়ালেন। মুখে কোন কথা নেই। একে একে তাকালেন আমাদের প্রত্যেকের মুখের দিকে। চারদিকে সূচীপতন নৈঃশব্দ্য। ঘোর কাটল মিনিট পাঁচ পর। তিনি মুখ খুললেন: লিভার ফেল করেছে, কিডনিও ফেল করল।' আবার অসহ্য নীরবতা। ডাঃ কোনার গাড়িতে ওঠার আগে বললেন: "ওঁর স্ত্রীকে বলবেন, রোগী কোন কষ্ট পাচ্ছেন না।"

গাড়ি চলে গেল। আমরা নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রস্তুত হলাম অবিশ্বাস্য একটি ঘটনার জন্যে।

ওদিকে সুপ্রিয়ার কান্না থামছে না, শান্তিদার ছটফটানি বেড়ে গেছে। রোগীর ঘরে জোর আলো। শ্বাসনালী ফুটো করে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস চালানো হচ্ছে। নার্স-ডাক্তার অতন্দ্র দাঁড়িয়ে। আমি এবং আমার মত আরও অনেকে মনে মনে প্রার্থনা করলাম : ভগবান, আমাদের কিছু পরমায়ু নিয়ে ভুলুকে বাঁচিয়ে দাও।

ভাবনা শেষ হল না, হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক কাক অলক্ষুণে আর্তনাদ করতে করতে শূন্যে মিলিয়ে গেল। অন্ধকার কেঁপে উঠল। ভয় বেড়ে গেল।

কাল রাত্রি পোহাল। ১৫ই সেপ্টেম্বর, রবিবার ভোর পাঁচটা। রাত কেটেছে। তাহলে হয়ত আবার আশায় বুক বাঁধা যাবে। সুপ্রিয়াকে ঠেলে বাড়ি পাঠানো হল হাতমুখ ধুয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে চলে আসতে। শান্তিদারাও চলে গেলেন।

বেলা ৫-৩০ মিঃ। সুপ্রিয়ার গাড়ি যে-ই ফটক পেরিয়েছে, ভুলুর ঘরের বারান্দা থেকে নার্সের চিৎকার : তাড়াতাড়ি আসুন।

রাণাদা আর আমি গাড়ি নিয়ে ছুটলাম। পথে সুপ্রিয়াকে ধরতে হবে। পেলাম না। মাতালের মত গাড়ি নিউ আলিপুরের পথ ধরল। বাড়ির সামনে থেকে আবার ওদের নিয়ে আসা হল হাসপাতালে। সুপ্রিয়া যখন ভুলুর ঘরে ঢুকল বেলা তখন ৫-৫০ মিঃ। ভোরের আলো উজ্জ্বল। সুপ্রিয়া ভুলুর হাত ধরল। শ্বাস তখনও পড়ছে।

নীচে নেমে এলাম। শান্তিদারাও সবাই এসে গেছেন। কে একজন জানিয়ে দিয়ে গেলেন শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে ৬টা ১০ মিনিটে। চিকিৎসা বিজ্ঞান, শুভেচ্ছা, সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। ভুলু আর নেই।

পরের ঘটনা ঠিক মনে নেই। যন্ত্র-চালিতের মত কী যেন একের পর এক হয়ে গেল। ফুল এল, লরী এল, কুকুল বাবাকে শেষ

দেখা দেখতে এল, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আরও অনেকে এলেন। ভুলুর জন্যে নতুন পাঞ্জাবি, তাঁতের ধুতি এল। এরই ফাঁকে আমি যেন কাকে বললাম—"একটা মাদ্রাজী চাদর নিয়ে আসুন, ও পরতে ভালবাসত।"

ভুলুকে সুন্দর করে সাজিয়ে নীচে নামানো হল। দেখে চমকে উঠলাম! ওর মুখে সেই পরিচিত চাপা হাসি। এ হাসি কোত্থেকে পেল? এতদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেও মুখে একটুও যে বিকৃতি নেই! যেন এক্ষুনি উঠে সাহিত্য-সভায় কবিতা পড়তে যাবে।

সাড়ে দশটায় লরী রাজপুত্রের মত সুন্দর, সুসজ্জিত ভুলুকে নিয়ে রওনা হল। আমার বুকটা ধক করে জ্বলে উঠল—আর তো ভুলুকে পাব না, এই তবে শেষ দেখা! কিন্তু ভুলুর তো ওখানে থাকার কথা নয়, আমার পাশে থেকে গোটা দৃশ্য দেখার কথা।

মনে পড়ে গেল সাড়ে ছ' বছর আগে আমাকে লেখা ভুলুর একখানি চিঠি। মস্কো যখন রওনা হয়, হাওড়া স্টেশনে আমরা তাকে বিদায় দিই। সেই চিঠিতে যা লিখেছিল, আজকের এই দৃশ্যের সঙ্গে যে একেবারে হুবহু মিল। ভুলু যেন আজকে সেই একই কথা বলছে—

"সেদিন তো হাওড়ায় তোরা হাত নেড়ে ক্রমশ দূরে চলে গেলি। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ধক করে বুঝে ফেললাম, আর তো তোদের পাব না। তুই রয়ে গেলি, বিশ্বজিৎ রয়ে গেল। লেবুও ওপাশে আড়ালে গিয়ে চোখের জল ফেলল। এতদিন যেভাবে থেকেছি, যাদের সঙ্গে থেকেছি, প্রতি মুহূর্তে অপরিসীম আনন্দে থেকেছি—ব্যস, তোদের সব রেখে কোথায় চললাম? সেখানে আর যাই থাক, তোরা নেই, আর ওই জীবনটা নেই। সব কিছু থেকে আমি যেন বাদ পড়ে গেলাম। যত আনন্দ, মজা, তোদের কাছে রেখে দিয়ে তোরা আমায় বিদেয় করলি। ট্রেন ছেড়ে দেবার আগে এক মুহূর্তও কোনও দুঃখ মনে আসে নি।

যখন ক্রমশ চলতে লাগলাম মনে পড়ল পথের মোড়ে মা দাঁড়িয়ে ঘোমটায় মুখ ঢেকে কাঁদছিলেন। আমি মোড়ের আড়ালে চলে গেলাম—তখনও দাঁড়িয়ে। আর তোরা। মেজদার মুখটাও একটু গম্ভীর ঠেকেছিল। তখনই সত্যি বুঝলাম ব্যাপারটা কী ভয়ংকর হল।"

সর্বনাশ, এ যে আজকের এই যাত্রার সঙ্গে ওই কথাগুলো খাপ খেয়ে যাচ্ছে! তবে কি ভুলু আগেই আমাকে তার চিরবিদায়েব আভাস দিয়ে রেখেছিল? "ভয়ংকব" ব্যাপারের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল? কিন্তু ওর মুখে তো দেখছি তৃপ্তির চিহ্ন। তবে?

তার উত্তরও আছে। ওই একই চিঠিতে। সে তারপরেই লিখছে—

"একদিক দিয়ে ভাল হল। অনেকদিন ধরেই নানা কিছু দেখে আমার মনে হয়েছিল, আমি বোধহয় insensate হয়ে গেছি। দুঃখ জিনিসটার অনুভূতি ছোটবেলায় যেমন ছিল, এখন তাব চেয়ে অনেক ভোঁতা হয়ে গেছে। মনটাই অসাড় হয়ে গেছে। ট্রেনের ওই সময়টায় বুঝলাম তা নয়। It's a great relief!"

আজকে ওর মুখে, ওব ঠোঁটে কি সেই "great relief" ফুটে উঠেছে? আমি ভাবতে পারছিলাম না। দম আটকে আসছে।

চোখ খুললাম। ভুলু কেওড়াতলা শ্মশানের দিকে চলেছে। আমি পেছন পেছন। ওব মুখটা হঠাৎ দেখা যাচ্ছে। পব মুহূর্তে কেমন যেন মনে হল, গোটা ব্যাপাবটাই unreal, অবাস্তব। আসলে যেন গত সাত দিন ধবে একটা নাটক হল এই হাসপাতালে। ভুলুব পার্ট নায়কেব—সে মৃত্যুপথযাত্রী রোগী। ডাঃ কোনাববে পার্ট ডাক্তারের। আমাদের ভূমিকা শোকার্তের। আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের পার্ট চমৎকার করে যাচ্ছি। তার মধ্যে বরাবরের মত ভুলুর অভিনয়ই 'বেস্ট'। একটু পরেই নাটক শেষ হবে। ভুলু

উঠে দাঁড়াবে, বলবে—"দেখলি তো কী সুন্দর অভিনয় করলাম, পারবি তোরা এইরকম করতে?"

ভুলুর গাড়ি আরও এগিয়ে গেল। সব ঝাপসা, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, শুধু সাদা সাদা ফুল, কয়েকটি গানের কলি, কয়েকটি কথা, টুকরো টুকরো হাসি। ভুলু হাসছে।